দুঃখ-দুর্দ্দশাকে আপনার কাঁধে তুলে নিয়েচে, একটা সর্ব্বস্বান্ত লোকের জীবনসঙ্গিনী হয়ে চলেচে, এ কেমন লাগে তোমার? আশা করি তুমিও একদিন তারই মত একটি নারীর সাক্ষাৎ পাবে। তার চুল সাদা হয়ে যাচ্চে, মুখে রেখা পড়চে এ কথা সত্য। পূর্ব্বের মত তার দেহে সেই ঋজুতাও নেই। হাতদু'টিও লাল ও শীর্ণ হয়ে গেছে। তবু আমার চোখে এ সবের একটা নিজস্ব প্রাণ আছে, সৌন্দর্য্য আছে। কারণ আমি জানি যতবার নতুন বিপদ এসে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে পেয়েচে, ততবারই মহাকাল এক একটি রেখা এই মুখে এ'কে দিয়ে গেছে।......এক একদিন সে হাসে। সে হাসি এখন জোর-করা, আর দুঃখে ভরা। তবুও ওই হাসি—যখন আমাদের চারিদিকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য হিম হয়ে আস্‌ছিল, উত্তাপের আশায় আমরা যখন পরস্পরে পরস্পরকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, —সেই—সেই সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সুখ আমাদের দুঃখ আজ আমার প্রিয়াকে এই রকম করে রূপান্তরিত করেচে। দুনিয়া হয় ত ভাবচে সে বুড়ী হয়ে যাচ্চে; আমার চোখে কিন্তু সে দিন দিন আগের চাইতে আরও সুন্দর হয়ে উঠচে।

যাক, এবার তোমায় যা বলতে চাচ্চি তাই বলি। সন্তান দু'টিকে যে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া সহজ হয় নি তা তুমি বুঝবে। আর তারা যখন ক্রমাগত কেবলই বাড়ী আসবার জন্য মিনতি করে' চিঠি দিতে থাকে তখন যে খুব ভাল লাগে তাও নয়। তবু যাহোক আমাদের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে 'আস্‌টা' ছিল। তুমি যদি তাকে দেখতে! তুমি যদি ভাই পিতা হ'তে, আর তোমার যাতনা-ক্লিষ্ট দেহ-মন বড় দু'টি সন্তানের প্রতি তোমায় প্রায়ই কর্কশ এবং রূঢ় করে' তুলতো, তাহ'লে যেটি এখন বাকী রয়েচে তাকে ভালোবাসার মমতা দিয়ে, সেই অন্যায়গুলোকে নিশ্চয়ই মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে,—করতে না কি? 'আস্‌টা' নামটি বেশ সুন্দর, না? কল্পনা করবার চেষ্টা কর—একটি রোদে-পোড়া ছোট্ট মেয়ে, কালো কালো চুল, আর তার মায়ের মতো সেই সুন্দর ভুরু, সদাই ব্যস্ত তার পুতুলদের নিয়ে। কখনো কাঠ সংগ্রহ করে' আনা হচ্চে, ওদিকে তার মা সকলের জন্য রুটি করচেন, এদিকে সে তার বাবার জন্যে ছোট ছোট 'কেক্' তৈরী করচে, কখনো ছাতের পাখীদের সঙ্গে কথা হচ্চে, মাঝে মাঝে গান হচ্চে;—হয়তো কি একটা হারানো সুর মাথায় এসেচে। মা যখন তার মেজে পরিষ্কার করা নিয়ে ব্যস্ত ছোট্ট 'আস্‌টা' তখন তার পেছনে এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে চেয়ারটাকে হয়তো পরিষ্কার করচে। তারপর শেষটায় একটা ভয়ানক কাণ্ড করে' হয়তো ব্যথা পেল,—অমনি চীৎকার ও দৌড়, বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু আবার আনন্দে গান ধরা। তুমি হয়তো কামারশালে কাজ করচ, ছোট্ট পায়ের একটু শব্দ এলো, তারপরেই একেবারে 'ব্যাবাগো, খেতে এসো'—তারপর হয় ত ছোট্ট দুটি হাতে তোমায় ধরে' দোরের দিকে নিয়ে চললো। "বাবা, আজ রাত্তিরে আমায় চান্ করিয়ে দেবে তো?" কিম্বা— "বাবা, এই নাও তোমার ন্যাপকিন্।" ডিনারে হয়তো শুধুই আলু আর দুধ, তবু তার খাওয়া চলচে যেন সে মস্ত ভোজে বসেছে। "বাবা, আলু, দুধ তোমার খুব ভাল লাগে, না?" নানাপ্রশ্নের ব্যগ্রতায় কত রকমের মুখভঙ্গী তার! রাত্তিরে আমাদের বিছানার পায়ের দিকের বাক্সে সে ঘুমোয়; এমন ধারা প্রায়ই হয়েচে যে তার লঘু, শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আমারও প্রাণটাকে শান্তিতে ভরে দিয়েচে, যেন তার ছোট্ট দুটি হাত আমার হাত ধরে ওই স্বর্গীয় সুন্দর ঘুমের দেশে আমায় নিয়ে গেছে।

তারপর, যতই ঘটনাটার দিকে এগুচ্চি, ততই লেখা কঠিন হয়ে উঠচে—হাত কাঁপচে। কিন্তু আমি আশা করি যে, যেমন শেষে আমি আর মার্লে সান্ত্বনা পেয়েচি, হয় তো তুমিও এতে কিছু সান্ত্বনা পাবে।

এখানে আমাদের সব চেয়ে কাছে যারা ছিল তারা আমাদেরই মতো গরীব—এক কাঁসারি আর তার স্ত্রী।

আমরা আসার অল্প পরেই, সেই কাঁসারির সঙ্গে আলাপ করতে যাই। দেখলাম, বেচারী শীর্ণকায় ছোট-খাট একটি প্রাণী, এসিড নিয়ে এলোমেলো ভাবে কাজ করচে, আর বাসনপত্র জোড়া-তাড়া দিয়ে তার যথাসাধ্য জীবিকা অর্জ্জন করচে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে সে বললে, "কি চাই?" তারপর, যেই আমি বেরিয়ে এলাম, শুনলাম পেছনে সে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। হায়, বেচারার ভয় হয়েছিল, আমি বুঝি তার রুটি কেড়ে খেতে এসেচি। তার স্ত্রী ছিল খুব মোটা, বড় বড় হাড়, একটি মাংসপিণ্ড বললেই হয়। তার চাল-চলনও আবার রীতিমত উদ্ধত, যদিচ কিছুকাল আগেই সে জেল থেকে ফিরে এসেছিল। একটি মেয়েকে বিপথে নিয়ে যাবার অপরাধে সহায়তা করেছিল বলেই তার এই শাস্তি।

একদিন রবিবার ভোরবেলা তার বাগানের পুষ্পিত কয়েকটা আপেল গাছের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটা গাছ বেড়ার এত কাছে ছিল যে, ডালগুলো আমার জমির ওপরেই ঝুঁকে পড়েছিল। আমি ফুলের গন্ধ নেবার জন্য একটি ডাল ঝুঁকিয়েচি, আর অকস্মাৎ এক চীৎকার—'এই বাঘা, লোকটাকে ধর্।' তার পর কাঁসারির মস্ত নেকড়ে কুকুরটা লাফিয়ে এসে আমার গলা কামড়ে ধরে আর-কি! ভাগ্যি ভালো যে আমার কোনো অনিষ্ট করবার আগেই আমি ওর 'কলার'টা ধরে ফেলেছিলাম। ওটাকে মালিকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম যে, যদি ফের এরকম হয় তা হলে আমি 'শেরিফে'র লোককে ডাকবো। তার পর গানের পালা সুরু হলো। সংযমের বাঁধ খুলে গেল। আমার সম্বন্ধে তার মতটি সে খুলে বললে, "মুখ সামলে কথা ক' হতভাগা লক্ষীছাড়া, এখানে এসেচে ভালো লোকের মেহনতের রুটি কেড়ে খেতে, ইত্যাদি ইত্যাদি।" সাপের মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে সে এই সব কথা বলতে লাগল, আর বাহু আস্ফালন করতে লাগল। শেষে আমার মনে হলো যেন আমার মাথায় ছুঁড়ে মারবার জন্য সে ছুরি কিম্বা এমনি-কিছুর সন্ধান করচে। না হেসে পারলাম না। এই পৃথিবীব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুটি বড় জাতের মাঝে যা চলে' তারি একটা বেশ উঁচুদরের অভিনয় হলো আর-কি!

দুদিন পরে আমি হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় স্ত্রীর চীৎকার কানে এলো। ছুটে বেরিয়ে গেলাম ব্যাপার কি দেখতে। এতক্ষণে মার্লে বেড়ার কাছে চলে গেছে। এক নিমেষেই দেখতে পেলাম—'আস্টা' মাটির পরে একটা মস্ত জানোয়ারের দেহের নীচে পড়ে—

তার পর—থাক্,—মার্লে বলে যে জানোয়ারের নীচে থেকে আমিই নাকি কাপড়ের ছোট্ট বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের ছোট্ট মেয়েটিকে বাড়ী নিয়ে আসি।

বিপদের সময় ডাক্তার প্রায়ই সুন্দর আশ্রয় বটে, কিন্তু সে যত সুন্দর করেই একটা শিশুর গলার ছেঁড়াটাকে সেলাই করে দিক, তা থেকে এ তো বোঝায় না যে তাতে উপকার হবেই।

তবু মা তাকে যেতে দেবেই না; মা কেঁদে, মিনতি করে, টানা-টানি করে তাকে কেবলই আর একবার কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে বলে। শেষে যখন সে চলে যায়, সে আবার ডেকে আনতে যেতে চায়, মাটির পরে লুটোপুটি খেতে থাকে, চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করে—সত্যি বলে' সে যা জানচে, তা যে সে বিশ্বাস করতে চায় না, বিশ্বাস করতে পারে না।

সেই রাত্রে একটি মা আর একটি পিতা একসঙ্গে জেগে কাটালো সুমুখের দিকে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে। মা শান্ত হলো। সন্তানকে তৈরী করে সাজিয়ে কবরের জন্য শুইয়ে দেওয়া হলো। পিতা বাতায়নের পাশে বসে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। তখন মে মাস, রাত্রি ধূসর।

এতদিনে উপলব্ধি করলাম, প্রত্যেক বৃহৎ শোক কেমন করে আমাদের সত্তার শেষ উপকূলে নিয়ে যায়। এত দিনে আমি একেবারে সর্ব্বশেষ তটভূমিতে এসে ঠেকলাম—এর পরে আর মাটি রইল না।

প্রিয় বন্ধু, আরো দেখলাম যে, দুঃখ-দুর্দ্দশার এই কটি দীর্ঘ বৎসর আমায় শুধু এক ছাঁচেই ঢালাই করেনি, অনেক ছাঁচে তৈরী করে তুলেছে, কারণ আমার মাঝে কয়েকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার উপাদান ছিল। এত দিনে কাজ শেষ হলো, এখন তারা আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রয়াণ করতে পারবে।

দেখলাম, একটা লোক স্বর্গ মর্ত্ত্যের পানে ঘুসি বাগিয়ে রাত্রির মাঝ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ; উন্মাদটা এই প্রহসনে আর অভিনয় করবো না বলে' নদীর দিকে ছুটে চলে গেল।

কিন্তু আমি তখনো চুপ ক'রে বসে রইলাম।

আর-একটি ছোট্ট প্রাণীকে মুক্ত হ'তে দেখলাম। ছাইয়ের মতো রং এক দীন সাধু,—আঘাতের সামনে মাথা নত করে সে বললে, "তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। প্রভু দিয়েছিলেন, প্রভুই ফিরিয়ে নিয়েচেন—" দীন করুণ এই বেচারী, রাত্রির মাঝে ধীরে ধীরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিন্তু তখনো চুপ করে বসে রইলাম।

জীবনের শেষ সীমায় সঙ্গীহীন একলা বসে রইলাম, সূর্য্য তারা নিভে গেল, একটা হিমশীতল শূন্যতা আমার অন্তরে-বাইরে চারিদিক ঘিরে রইল শুধু।

কিন্তু, বন্ধু আমার, তখন ধীরে ধীরে আমার এই অনুভব হতে লাগল যে, তবু যেন কিছু আমার রইল, সে আমার মধ্যে একটি ছোট্ট দুর্জ্জয় অগ্নিশিখা, আমার মাঝে স্বতোদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল—মনে হলো যেন আমি আমার সৃষ্টির প্রথম দিনের কোলে ফিরে এসেচি, যেন আমার মাঝে একটি নিত্যকালের ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে বলে উঠলো : জ্যোতির আবির্ভাব হোক।

এই ইচ্ছা আমার মাঝে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে চললো, আমায় বলিষ্ঠ করে তুললো।

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবার পরে এক অব্যক্ত করুণা জেগে উঠলো, তবু সর্ব্বশেষে গর্ব্ব অনুভব করলাম যে আমিও তাদেরি একজন।

অন্ধ নিয়তি কেমন করে' সর্ব্ব রিক্ত করে' আমাদের লুণ্ঠন করতে পারে তা বুঝলাম, এও বুঝলাম যে তবু শেষে এমন একটা বস্তু আমাদের মাঝে রয়েই যাবে যাকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের কোনো কিছুই জয় করতে পারে না। দেহের মৃত্যু ধ্রুব, নিশ্চিত, আমিত্বের নির্ব্বাণও স্থির, তবু আমাদের মাঝে সেই অগ্নিশিখা রয়েচে, ভগবানের জন্য এবং বিশ্বের জন্য সেই নিত্যকালের জ্যোতি এবং সমন্বয়ের বীজ রয়েচে।

এখন বুঝলাম যে, আমার জীবনের সেরা বছরগুলো যার ক্ষুধায় কেটেচে, সে জ্ঞান নয়, সম্মান নয়, সম্পদ নয় ; ইস্পাতের রাজ্যে মস্ত স্রষ্টাও আমি হ'তে চাই নি, ধর্ম্মযাজকও হতে চাই নি ; না বন্ধু, আমি চেয়েছি মন্দির গড়ে তুলতে ; প্রার্থনা-বেদী করতে নয়, অনুতপ্ত পাপীদের আর্ত্তনাদের জন্য গির্জ্জা গড়তে নয়, কিন্তু মহীয়ান মানবাত্মার পূজার জন্য মন্দির গড়তে, যেখানে আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে একটি মহান্ সঙ্গীতের অর্ঘ্য করে' স্বর্গের পানে তুলে ধরতে পারবো।

আমার পক্ষে কিন্তু আর তা করা সম্ভব নয়। বোধ করি পৃথিবীতে এমন কিছুই রইল না, যা আমি আর করতে পারি। তবু সেইখানে বসে বসে আমার মনে হলো যেন আমারই জয় হয়েচে।

কি হলো তারপর ? হ্যাঁ, বলি—সারাটা বসন্তকাল ধরে ভয়ানক শুকনো হাওয়া বইল'—এই উপত্যকায় প্রায়ই এম্নি হয়ে থাকে। সেই চিরকেলে উত্তুরে হাওয়া সারাটা দেশের ওপর দিয়ে ধূলোর আঁধি বইয়ে দিয়ে গেল ; আমাদের আশঙ্কা হলো যে যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে এবারও ভীষণ অজন্মা হবে।

শেষটায় লোকেরা সাহস করে তাদের বীজ বুনলে, কিন্তু তখন বরফ পড়া আরম্ভ হলো। বরফ, জল, বীজ সব মাটির মাঝে জমে রইল। আমার প্রতিবেশী কালারি তার জমিতে বার্লি বুনেছিল—কিন্তু এখন আবার বোনার দরকার,—বীজ কোথায় ? বাড়ী বাড়ী সে বীজ ভিক্ষা করে ফিরলো, কিন্তু 'আস্টা'র সেই ঘটনার পর থেকে

লোকে তাকে দেখতেও ঘৃণা করতো—কেউ তাকে ধার দিতে রাজী হলো না। বীজ কেনার অর্থও তার ছিল না। রাস্তায় ছেলেরা তাকে দূর দূর করতে লাগল, প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তাকে 'প্যারিশ' থেকে তাড়ানোর কথা বলতে লাগল।

পরের দিন রাত্তিরেও বিশেষ ঘুমুতে পারলাম না, দুটো যখন বাজল, তখন উঠলাম। মার্লে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ?" আমি বল্লাম, "দেখি আধ বুশেলটাক্ বার্লি আমাদের আছে কি না!" "বার্লি? এই মাঝ-রাতে কি হবে বার্লি দিয়ে?" "কাঁসারির জমিটা বুনে আসতে চাই, এখন করাই ভালো, কেউ জানতে পারবে না যে আমি করলাম।"

মার্লে উঠে বসলো, আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল, "কি? ও-ওর? সেই কাঁসারির?"

আমি বল্লাম, "হ্যাঁ, তার জমিটা সারা গ্রীষ্ম যদি খালি পড়ে থাকে তাতে আমাদের তো কোনো লাভ হবে না!"

"পীথার, তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"বল্লাম তো" বলে' আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি জানতাম মার্লেও আসবার জন্মে কাপড়-চোপড় পরচে।

রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল। যখন বেরিয়ে এলাম তখন বেশ মৃদু হাওয়া দিয়েচে। উষার অস্ফুট ধূসরালোকে তখন উত্তরের মেঘ থেকে হলদে আভা এসে মিশেচে। হাওয়ায় ফুটন-উন্মুখ বার্চ্চের গন্ধ ভেসে আসছিল আর ম্যাগ্‌পাই-ষ্টারলিংরা জেগে উঠে চলাফেরা করছিল, কিন্তু একটি মানুষও তখন দেখা দেয়নি। গোলাবাড়ী, গ্রাম—সব তখনো ঘুমিয়ে আছে।

চুপড়িতে করে বীজ নিলাম। প্রতিবেশীর বেড়া ডিঙিয়ে বোনা সুরু করলাম। বাড়ীতে জনপ্রাণীর কোনো সাড়াই নাই। শেরিফের কর্ম্মচারী এসে আগের দিন কুকুরটাকে গুলি করে মেরে গিয়েছে; নিঃসন্দেহ স্বামী-স্ত্রী তখন ঘুমোচ্ছিল, হয়ত চারদিকে শত্রুর স্বপ্ন দেখছিল আর যথাশক্তি তাদের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছিল।

প্রিয় বন্ধু, আর বিশেষ-কিছু বলবার দরকার আছে কি? তবু ভেবে দেখো ভাই, যে, একজন হয়তো একটা রাজ্য দান করতে পারে, তাতে তার কিছুই আসে যায় না। আর-একজন কয়েকমুষ্টি মাত্র শস্য দান করতে পারে, কিন্তু সেই দেওয়া মানে শুধু তার যথাসর্ব্বস্ব দান করা নয়; এই দানটুকু করতে গিয়ে তার অন্তরাত্মাকে একটা মস্ত সংগ্রাম জয় করতে হয়েচে। তোমার কি মনে হয়, এটা কিছুই নয়? যদি আমার কথা বল ভাই, আমি ক্রাইষ্টের মুখ চেয়ে একাজ করিনি কিম্বা আমি আমার শত্রুকে ভালবাসি বলেও নয়; আমার জীবনের ধ্বংসাবশেষের পরে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব অনুভব করচি বলেই আমি একাজ করেচি। মানব-জাতিকে উঠতে হবে। যে-সব অন্ধশক্তি তাকে নিয়ন্ত্রিত করচে, তার চেয়ে ভালো হতে হবে তাকে। তার দুঃখরাশির মাঝখানেও তাকে সাবধান হতে হবে, যাতে তার দেবত্ব না নষ্ট হয়ে যায়। অনন্তের শিখা আমার মাঝে একদিন দীপ্ত হয়ে উঠে বলেছিল, 'আলোকের আবির্ভাব হোক।'

ক্রমশঃ এই কথাটাই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে যে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে মানুষকেই দেবত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এইখানেই বিশ্বের অনন্ত জড়শক্তির উপর মানুষের জয়। এই জন্যেই আমি বেরিয়ে গেলাম, আমার শত্রুর ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে এলাম, যাতে ভগবান বেঁচে থাকতে পারেন। আহা, যদি তুমি সে মুহূর্ত্তটা একবার অনুভব করতে পারতে! মনে হলো যেন কাদের কণ্ঠে বায়ুমণ্ডল সজীব হয়ে উঠলো। জীবনে আমি যত ভাগ্য-হীন মানবকে দেখেচি ও জেনেচি, তারা যেন সবাই এসে আমার সাথী হয়ে জুটতে লাগল। তারা কেবলি আসতে লাগলো। যারা মৃত, তারাও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে। অতীত কালের বুক থেকে এক বাহিনী এসে যোগ দিলে। বোন্ লুইসে সেখানে তার সেই সুরটি বাজাতে লাগ্‌লো। জীবিত

এবং মৃত—সমগ্র মানবজাতির মহাসঙ্গীতে সে সকলের কণ্ঠকে এনে মিলিয়ে ধরলো। দেখ, এই তো আমরা সব, তোমার ভাই, তোমার বোন। তোমার নিয়তি আমাদেরও নিয়তি। বিশ্বজগতের উদাসীন নিয়ম আমাদের এমন এক জীবনের মাঝে ফেলেচে, যেখানে আমাদের ইচ্ছামত কিছু করবার উপায় নেই। অন্যায়, রোগ শোক, আগুন, রক্ত, আমাদের বিধ্বস্ত করচে। সব চেয়ে সুখী যে, তাকেও মরতে হবে। তার নিজের ঘরেও সে মাত্র একজন ক্ষনিকের অতিথি। সে জানে না যে হয়ত কালই তাকে চলে যেতে হবে। তবু মানুষ তার এই সকরুণ ভাগ্যের মুখের পরে হাসে। তার এই দাসত্বের মাঝখানেও সে পৃথিবীতে সুন্দরকে রচনা করেচে। তার যাতনার মাঝখানেও তার অন্তরাত্মার এত শক্তি উদ্বৃত্ত রয়েচে যা দিয়ে সে এই হিমশূন্যের বুকটাকেও ভগবান্ দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে পেরেচে।

—হে মানবাত্মা, তুমি এমনি পরমাশ্চর্য্য, স্বভাব তোমার এমনি দেবত্বময়। মরণের ফসল কেটে সেখানে তুমি চিরন্তন জীবনের স্বপ্ন বপন করেচ, তোমার মন্দ ভাগ্যের পরে প্রতিশোধ নিয়েচ এই বিশ্বকে প্রেমময় ভগবান্ দিয়ে পূর্ণ ক'রে।—

তাঁর সৃষ্টিধারায় আমরা আমাদের কাজ করেচি, যারা আজ ধুলো হয়ে গেছি সেই আমরা, যারা অন্ধকারে নিবে-যাওয়া শিখার মতো ডুবে গিয়েছি, সেই আমরা।—আমরা কেঁদেচি, আনন্দ করেচি, তীব্র যাতনা এবং উল্লাস অনুভব করেচি, কিন্তু সবাই আলোকের বিশাল সমুদ্রে আমাদের আলোক-রেখাটিকে ঢেলে দিয়েচি, —আমরা প্রত্যেকে; যে নিগ্রো তার মৃতের কবরের পরে সামান্য স্মৃতিচিহ্ন এঁকেচে, তার থেকে সুরু করে সেই প্রতিভা পর্য্যন্ত যে আকাশের পানে মন্দির-স্তম্ভ তুলেচে। যে বেচারী মা তার শিশুর দোলনার পাশে প্রার্থনা করেচে, তার থেকে সুরু করে সেই মহাবাহিনী যাদের স্তব সঙ্গীত ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে মিশে গেছে—আমরা প্রত্যেকে আমাদের কাজ করেচি।

—হে মানবাত্মা, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর। তুমি এই বিশ্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেচ, তাকে লক্ষ্য দিয়েচ। তুমিই সেই মহান্ সঙ্গীত—যা বিশ্বকে সামঞ্জস্য দান করেচে। নিজের দিকে ফেরো, মাথা উঁচু করে গর্ব্বভরে অমঙ্গলের সুমুখে দাঁড়াও। দুঃখ দুর্দ্দশা তোমায় নিষ্পেষণ করতে পারে, মৃত্যু তোমায় লুপ্ত করতে পারে, তবু তুমি অজয়, তুমি চিরন্তন!

প্রিয় বন্ধু, আমার এই অনুভব হয়েছিল। যখন বীজ বোনার পর আমি ফিরে যাচ্ছি, তখন পাহাড়ের কাঁধের উপর দিয়ে সূর্য্য দেখা দিয়েচে। বেড়ার পাশে আমার দিকে তাকিয়ে মার্লে দাঁড়িয়ে। চাষার মেয়েদের মতো কপালে তার একটা রুমাল বাঁধা ছিল বলে' মুখে তার ছায়া পড়েছিল; কিন্তু সে আমার পানে চেয়ে মৃদু হাসি হাসলো—মনে হলো এই প্রত্যূষে এই ব্যথাহতা মা-ও তার দুঃখ-সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়িয়েচে, যাতে সেও ঈশ্বর সৃষ্টির কাজে যোগ দিতে পারে… …

অনুবাদক—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

বেনামি বন্দর

জনি ও টনি

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিলাতি কুকুর, তাই ইংরেজি নাম ;—জনি ও টনি। এক মা'র পেটের ছুটি বোন।

জনির গায়ের রং ঠিক চিতাবাঘের মত, আর টনি ছিল—ফিট্ সাদা।

জনির কপাল ভাল। গলায় রূপোর মত ঝকঝকে' ঘুঙুর-দেওয়া কালো-চামড়ার বক্‌লস্,—ভাল খায়, ভাল থাকে। জ্যেঠামশাইএর ঘরে তখন খুব বাড়-বাড়ন্ত, শহরের কারবার বেশ ভালই চলে, চাল-ধানের বাজার তখন খুব গরম।

শহর থেকে জনির জন্যে টিন-ভর্ত্তি বিস্কুট আসে,—আর ভাল-ভাল সাবান।

টনি ত' টনি—আমরা নিজেরা কখনও সে-রকম সাবান মাখিনি।

স্নান করতে গিয়ে দিদি সেদিন পুকুরের ঘাট থেকে ফিরে এল।

"নাঃ, চান্ করা আর হলো না দেখ্‌ছি! কুকুরকে আবার সাবান মাখায় কোন্‌কালে—পুকুরের ঘাটে? জ্যেঠামশাইএর ছেলে ত' নয়,—যেন এক একটি—"

সুমুখ দিয়ে আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার উপর নজর পড়তেই দিদি বলে' উঠ্‌লো, "এই যে! ইনিই বা আমাদের কিসে কম? বেশ ত' ছিল বাপু,—ছটো বাচ্চাই ছিল ওদের ঘরে, তুই আবার মর্‌তে কি জন্যে আনতে গেলি একটা,—বল্ ত?"

"তুমি জান না দিদি, কেমন ডাকে দেখেছ খেউ খেউ করে'?—চোর তাড়ায়।"

দিদি বলে,

"হ্যাঁ, ধান-চালের ত' ছড়াছড়ি, তাই চোর আসছে রোজ চুরি করতে। এনেছিস—বেশ করেছিস্, ওই কলাতলায় বেঁধে রাখ্—ছাড়িস্‌নে। ছাড়া পেয়েছে কি, এক্ষুনি ঘর-দোর সব ভাসিয়ে দেবে হেগে-মুতে'।"

টনির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দিদি চলে যায়। বলে,

"চোর তাড়ায়! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধি-রাম সদ্দার! একরত্তি কুকুর, একটা লাথির ভার সয় না—চোর তাড়াচ্ছে......চেঁচায় কি সাধে? চেঁচায়—ভয়ে।"

টনি আমাদের কলাতলাতেই বাঁধা থাকে। দিদির চক্ষুশূল।

খেতেও পায় তেমনি!

এর-ওর উচ্ছিষ্ট ভাত-কাঁটা—পাতে যা পড়ে থাকে, নিতান্ত অগ্রাহ্য করে' টনির মুখের কাছে দিদি তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—পেটের জ্বালায় টনি গব্-গব্ করে' গেলে।

সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি—টনি আমাদের তিন-পায়ে হাঁটছে। পেছনের একটা পা তার খোঁড়া।

ছোট বোন্ হেনা বললে,

"আর একটু হলেই টনি তোমার আজ মরেছিল দাদা!"

"কেন?"

"মাছের কাঁটা লেগেছিল গলায়।"

"কাঁটা ?"

"হ্যাঁ, কেশে' কেশে' বমি করেছিল দু'বার। দিদি তখন করলে কি—"

হেনা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বল্লে, "বলে, খালি-খালি কাশছে দ্যাখ্ হতভাগী খ্যাক্-খ্যাক্ করে'!—বলেই ভ্যাক্ করে' এক লাথি! আর-একটু হলেই—"

আরও কি-যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদিকে দেখেই মুখের কথা তার মুখেই আট্‌কে রইল।

দিদি বললে, "চুন আর হলুদ গরম করে' রেখেছি,—বেঁধে দে ও-হতচ্ছাড়ীর পায়ে।—মাছের কাঁটা কেন খেতে যাওয়া লো তোর সর্ব্বনাশী,—পোড়ারমুখী ?"

টনি কি বুঝলে কে জানে!

জিব বার করে' হাঁপাতে হাঁপাতে দিদির মুখের পানে সে মিট্ মিট্ করে' তাকিয়ে রইল।

* * *
* *

ছ'টি মাস পেরোতে-না-পেরোতেই টনি বেশ ডাগর হয়ে উঠলো।

খোঁড়া পা তার সেরে গেছে। এখন আর তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে যায়—আবার ঠিকসময়ে ফিরে আসে।—দরজার কাছে পড়ে' পড়ে' জিব বার করে' হাঁপায়।

গরু-ছাগল দেখলেই খেউ খেউ করে' ওঠে।—হাঁস-মুর্গী ত' ত্রিসীমানায় আসবার উপায় নেই।

সেদিন একটা কোলা ব্যাং বেরুলো মাটির ঘরের ফাটল থেকে। আর যায় কোথা! টনি ছিল দরজায় বসে'—ঝাঁপিয়ে উঠে তার সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

প্রাণের ভয়ে ব্যাংটা লাফিয়ে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। টনি খেউ খেউ করে' এগিয়ে যায়।

সুবিধা পেলেই ব্যাংটা আবার মারে লাফ্।

টনি ভাবে, বুঝি দিলে কাম্‌ড়ে! অমনি দু'হাত পিছিয়ে আসে।

এমনিধারা ঝাঁপাঝাঁপির লড়াই চললো কিছুক্ষণ।

ব্যাংটাই হারলো শেষে। টনি তার ধারালো দাঁত দিয়ে কোলা-ব্যাঙের পেটটা ফুটিয়ে দিলে। মোটা চামড়ার ভেতর থেকে নাড়ি ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। হাঁ করে' পথের মাঝে মরা-ব্যাংটা পড়ে রইলো।

টনির আনন্দ দেখে কে!

লেজ তার ছোটবেলা থেকেই ছিল না। গোড়ার দিকে ইঞ্চি-খানেক্ যেটুকু ছিল, তাই তখন টুক্ টুক্ করে' নড়ছে......

ঘুঙুরের শব্দ হতেই ফিরে দেখি,—বাঁটুল আসছে জনিকে নিয়ে। পুকুরের ঘাটে চললো বুঝি সাবান মাখাতে।

"ছোঃ! ভারি ত' একটা ব্যাং মেরেছে! জনি একটা পাখী মেরেছিল সেদিন।"

বললাম, "টনিও পারে।"

"হ্যাঁ, পারে—। জনির মত কথা শোনে? জনি! জনি! ক্রু!"

দূরে মরা-ব্যাংটা জনি তখন শুঁকে' দেখছিল। বাঁটুল ডাকতেই ঘুঙুর বাজিয়ে ঝুম্ ঝুম্ করে জনি তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

"কই, শুনুক্ দেখি—?"

জনির সুমুখের ছুটো পা উপরের দিকে তুলে ধরে' তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে—বাঁটুল বললে, "দাঁড়িয়ে থাক্—নড়িস্ নে।"

জনি মানুষের মত পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"দেখেছিস্? কই কাম্‌ড়াক্ দেখি? কখখনো কাম্‌ড়াবে না।"

বাঁটুল তার মুখের ভেতর—ডান-হাতের মুঠোটা ঢুকিয়ে দিলে। চুপটি করে' জনি দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে একটা পুকুরের পাড়ে তেঁতুলগাছের তলায় আমাদের টনি তখন মাটি শুঁকে' শুঁকে' বেড়াচ্ছিল।

ডাকলাম,—"টনি! টনি!"

টনি একবার ফিরেও তাকালো না।

* * *

জনির চারটে বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বড় না হতে হতেই সাদা বাচ্চাটা গেল মরে'। বাকি যে তিনটে থাকলো—সে তিনটে বড় হলো বটে,—কিন্তু বাঁটুলদের ঘরে কেউ আর রইল না। লাল বাচ্চাটা দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু মোড়লপাড়ার কুত্তিটার সঙ্গে তার যে কি সর্ব্বনেশে দোস্তি হলো কে জানে;—দিন নেই, রাত নেই, সেইখানেই পড়ে থাকে।

গাঁয়ে একদিন বিদেশী ভেড়ি-ওয়ালা আসে একদল। সঙ্গে তাদের কুকুর ছিল। কালো বাচ্চাটা সেই তাদের সঙ্গে কোথায় কোন্ দেশ দিকে যে চলে গেল—তার পাত্তা মেলাই ভার।

বাকি রইলো খয়রাটা। মনসাপুজোর সময় দূরের একটা গাঁ থেকে একজন মুসলমান দোকানদার আসে চুড়ি বেচ্‌তে। সেই-অবধি শুনছি নাকি সে তারই ঘরে আছে। বাঁটুল দুদিন তাকে আনতে গিয়েছিল, কিন্তু ডাকতে গেলেও আসে না—এমনি নিমক্-হারাম।

জনি এখন চুন্-মুন্ করে' বেড়ায়। পেটটা তার ঝুলে গেছে।

* * *

সম্ভবত কার্ত্তিক মাস। শীত তখন পড়ি-পড়ি করছে।

প্রকাণ্ড একটা সাদা-রঙের বাঘা-কুকুর কোত্থেকে এলো কে জানে! আমাদের ঘরে এসে আড্ডা গেড়েছে।

দিদি বললে, "এঁর আবার কোত্থেকে আগমন হলো, —এই মোহান্ত-মহারাজের?"

কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু তাড়ালে কি হবে, খানিক্ বাদেই দেখি, খিড়্‌কির ঘাটের দরজার নিচের নর্দ্দমার ফুটোর ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে গলিয়ে এসে বাঘা-কুকুরটা আবার আমাদের ঘরে ঢুকেছে।

কলাতলার ছায়ায় বসে বসে সে তখন তার আধহাত-খানেক্ জিব বের করে' হাঁস্ ফাঁস্ করছিল।

থাকে থাক্। কিন্তু দু'ইঞ্চি লম্বা মোটা মোটা ধারালো দাঁত,—ঝগড়া করে' টনিকে কামড়ায় যদি কোনদিন, তাহ'লে সে আর বাঁচবে না কিন্তু।

দিদি বলে, "তোমায় পেট ভরে' ভাত দিতে হলেই ত গিয়েছি আর-কি! আধসের চালের ভাত নইলে গোব্‌দার ও-পেট আর ভর্‌তে হয় না! হয় শুকিয়ে মর, নয় আধ-পেটা খাও, নইলে বাড়ী যাও। বুঝ্‌লে?"

কিন্তু ভারি মজা দেখলাম। কুকুরটা শুকিয়েই মরে, খায় না। সেদিন ভাত নিয়ে কত সাধ্য-সাধনা করলাম। কিছুতেই খেলে না।

টনির সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তাও না। দুজনে ভারি ভাব।

ও-বাড়ীর বৌ সেদিন আমাদের ঘরের দিকেই আসছিল।

আমাকে দেখেই খানিক্ হেসে বললে, "তোমাদের এক সন্নেসী জামাই এসেছে নাকি আজ কদিন? দেখে আসি চল।"

পৌষের দুরন্ত এক শীতের রাত্রে আমাদের টনির তিনটি বাচ্চা হলো। তুলোর মত নরম টুক্‌টুকে বাচ্চা তিনটি। কাঁচের চোখের মত ছোট ছোট্ট চোখ—তখনও ভাল করে' ফোটেনি।

কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব—প্রসব হবার পরদিন থেকে টনির কি যে হলো কেউ বুঝতে পারলে না। তিন দিনের দিন দেখা গেল, আমাদের গোয়ালের পাশে একগাদা খড়ের

ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে টনি মরে পড়ে আছে। পা-চারটে খাড়া সোজা হয়ে গেছে। বাঁপাশের চোয়াল বেয়ে সাদা খানিকটা ফেনার সঙ্গে রক্তও গড়িয়েছিল বোধহয়। সাদা খড় রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে।

দুটো বাচ্চা কুঁই কুঁই করে' ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর-একটা পড়েছিল—মরা-মায়ের মাই কামড়ে। এত জোরে কাম্‌ড়ে ধরেছিল যে টেনে ছাড়ায় কার সাধ্যি……

হেনা বলেছিল, "বেশ হলো দাদা, আমাদের তিনটে আর একটা—চারটে কুকুর হলো।"

পায়ে দড়ি বেঁধে টনিকে দূরের একটা মাঠের উপর ফেলে দিয়ে আসা হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর গিয়ে দেখি, শেয়াল-শুকুনির হাট বসে গেছে সেখানে। টনিকে নিয়ে তারা টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি সুরু করেছে।

বৈকালে গিয়ে টনিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। দেখলাম, শিরদাঁড়া আর পাঁজরার হাড় ক'খানা মাত্র পড়ে আছে।

বাড়ী ফিরে দেখি, ও-বাড়ীর জনি এসেছে আমাদের ঘরে। কোনদিন আসে না, আজ কিরকম এলো বুঝতে পারলাম না।

রাত্রে উঠে আলো নিয়ে টনির বাচ্চাগুলোর সন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম, গোয়ালের পাশে, টনি যেখানে মরে ছিল, জনি সেইখানে শুয়ে আছে। আর বাচ্চাতিনটি তার পেটের তলায় মুখ গুঁজে মাই টানছে।

জনি যখন-তখন আমাদের ঘরে আসতে লাগল। আসে আর সেই গোয়ালের পাশে পড়ে থাকে। টনির বাচ্চা তিনটিকে মাই দেয়।

কোন কোন দিন সারারাত থাকে, সারাদিন থাকে—।

পাঁচ সাত দিনের পর একদিন সকাল বেলা—সূয্যি তখনও ওঠেনি।

গত রাত্রে জনি আমাদের ঘরেই ছিল।

বাঁটুল দরজায় এসে হাঁকছে!

দরজা খুলতেই সে আর আমায় কিছু বললে না। একেবারে গোয়ালের পাশে গিয়ে হাজির! শিকলিটা তার হাতেই ছিল। জনির গলার বকলসে লাগিয়ে জনিকে সে টেনে নিয়ে চললো।

জনি কিন্তু কিছুতেই যাবে না।

পেছনের পায়ের নখ দিয়ে সে মাটি চেপে ধরে। আর বাঁটুল তাকে সুমুখের দিকে টানে।

দুজনে মিলে সে কী টানাটানি! জনি ফিরে ফিরে আসতে চায়, আর বাঁটুল তাকে প্রাণপণে টেনে নিয়ে চলে।

দিদি বললে, "ছেড়েই দে না ভাই বাঁটুল, আহা, বাচ্চা তিনটে বাঁচুক।

বাঁটুল চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো, "না।"

জনিকে সেদিন সে টেনেই নিয়ে গেল।

সেদিন আর সে এলো না। আসতে দিলে না হয় ত।

তার পরের দিনও না। গাইয়ের দুধ খেয়ে আর কতক্ষণ বাঁচে, পরের দিন সকালে উঠে দেখি, কলাতলায় বাচ্চাটি পড়ে আছে।

একটি গেল।

বাঁটুলকে সেদিন ডেকে বললাম, "তাকে অন্তত একবার করেও ছেড়ে দে না ভাই, আমরা খেতে দিই ওকে।"

বাঁটুল বললে, "আমাদের ঘরেও উপোস্ দেয় না—খেতে পায়।"

সেদিন সকালে দেখি, একটিমাত্র বাচ্চা নড়বড় করে' বেড়াচ্ছে। আর-একটার খোঁজ করলাম। খিড়কির পাশে পুকুরের জলে সে ভাসছিল।

অন্ধকার রাত্রে হয়ত সে তার মরা-মার খোঁজে বেরিয়েছিল… …

রাত্রে আমরা তখন দরজা বন্ধ করে' শুয়েছি।

কে যেন দরজা ঠেলছে!

দিদি হাঁকলে,—"কে?"

উঠে গিয়ে দরজা খুললাম—জনি!

সাঁ করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

বক্‌লাসের সঙ্গে-আঁটা গলায় তার ছেঁড়া-শেকল মাটিতে লুটিয়ে ঝুন্ ঝুন্ করে' আওয়াজ হচ্ছে।

দিদি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দরজাটা বন্ধ করে' দিতে যাচ্ছি, গলার শেকলটা মাটির ওপর দিয়ে সর্ সর্ করে' টানতে টানতে জনি আবার এসে হাজির!

অবাক কাণ্ড!

টনির শেষ-বাচ্চাটির ঘাড়ে কামড়ে ধরে' সে তাকে মুখে করে' তুলে এনেছে।

কেন মিছেমিছি—আসতেও পায় না, তাই নিজের কাছেই নিয়ে চললো বোধ হয়।

ভালই হলো।

বাঁটুলদের ঘরে গিয়ে বাচ্চাটিকে প্রায়ই দেখে আসি।

দিনে দিনে বেশ বড় হয়ে উঠ্‌ছে।

দেখতে, হুবহু তার মায়ের মত।

জ্যেঠুমা বললেন, "হক্‌কথা বল্‌তে গেলে বাচ্চাটি আমাদেরই। রাখতে পারিস্‌নে ত' কুকুরের সখ কেন বাপু? জনি-টনি অম্‌নি আসেনি। দাম লেগেছিল, তার ওপর রেলের মাশুল না-হয় ছেড়েই দাও।"

গাঁয়ে হঠাৎ সেদিন আগুন লাগ্‌ল কেমন করে' কে জানে!

বিষ্টুমিস্ত্রির খামারে লাগে প্রথম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাশাপাশি আরও তিনখানা ঘর।

তারপর লাগ্‌লো, সরকারি কালীঘরে।

পাশেই বাঁটুলদের ঘর।

লাগ্‌লো ওদের রান্নাঘরের চালে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গোয়াল গেল।

জিনিসপত্র সাম্‌লাবার আর অবসর পেলে না কেউ!

মেজ্‌দি গরু-বাছুরগুলো খুলে' দিয়েছিল কিন্তু।

আমাদের ঘর যদিও দূরে—তবু সামলাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন।

দিদি জ্যেঠামশাইএর বাড়ীর দিকে ছুটেছিল। আগুন নিব্‌লে পর, খানিক্ বাদে—ছুট্‌তে ছুট্‌তে খবর নিয়ে এল—

"আর পুষ্‌বি? ভারি যে দিনকতক দহরম-মহরম হয়েছিল কুকুর নিয়ে! ওই দেখ্‌গে যা—বাঁটুলকে দিলে কাম্‌ড়ে! পা দিয়ে দর্ দর্ করে' রক্ত গড়াচ্ছে!"

"কে? জনি?"

"তা না ত কে? দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা বই ত' নয়!"

কিন্তু সে কথা বিশ্বাসই বা করা যায় কেমন করে! জনি কামড়াবে বাঁটুলকে?

"না তুমি জান না দিদি, জনি নয়—তাহলে আমাদের টনির সেই বাচ্চাটা হবে।"

দিদি কিন্তু তাকে স্বচক্ষে কামড়াতে দেখে এসেছিল। বললে, "আমি নিজে দেখে এলাম।"

"এমনি কাম্‌ড়ে দিলে ? শুধু-শুধু"

দিদি কিন্তু সেকথা জানতো না,—কামড়াতেই মাত্র দেখেছিল।

দরজার কাছে পাড়ার মেয়েদের তখন জটলা চল্‌ছে। আগুনে কার কি ক্ষতি হলো তারই হিসেব-নিকেশ।

একজন বললে, "না লো না, শোন্—আমি দেখে এলাম।"

আর একজন বললে, "গরু মরা, কুকুর মরা, একই কথা। পাশ্চিত্তি ত করতে হবে, না, তা হবে না? চঞ্চলীর বেশ বুদ্ধি যাহোক্! গরু খুললি, বাছুর খুললি, ছাগল খুললি,—আর ওই একরত্তি কুকুরটাকে খুলে দিতে পারলি না? আ মর্!"

"বাচ্চা কুকুরটাকে সাধে-সাধে পুড়িয়ে মারলে ঘরের ভেতর।—সে কী চেঁচানি বাছা! কাঁই, কাঁই, কাঁই, কাঁই,—পাড়াশুদ্ধু কলরব তুলে দিয়েছিল।"

যে মেয়েটা প্রথম আরম্ভ করেছিল, সেই শেষ করলে।

"বাচ্চাটার কাছে যাবার জন্যে ওদের ওই বুড়ি কুত্তিটার সে কী ছট্‌ফটানি মা, হাঁ হাঁ করে আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়! এমনি করে'-করে'—এম্‌নি করে'-করে'..."

সুমুখে দেওলটার ওপর নিজের হাত-দুটো দিয়ে আঁচড় কেটে কেটে মেয়েটা কোন রকমে সবাইকে বুঝিয়ে দিলে।

"ওই কুত্তিটাকে ধরতে গিয়েই ত—"

"হ্যাঁ, বাঁটুল ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।"

মুখের কাছে হাত নেড়ে মেয়েটা বল্‌লে, "বেঁধে আবার রাখ্‌লে কখন্ লা? বাঁধ্‌তে যাচ্ছিল, আর খপ্ করে' অম্‌নি দিলে কাম্‌ড়ে।"

হেনা তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিল না, দিদির মুখের পানে চেয়ে বল্‌ল, "তুমি সেদিন দেখনি দিদি, বাঁটুল এই এতখানা হাতের মুঠোটা পুরে দিয়েছিল ওর মুখে। কিচ্ছু বললে না—কামড়ালে না, কিছু না।"

দিদি বললে, "হ্যাঁ, ও-জাতকে আবার বিশ্বেস করে কখনও? রামঃ!"

কে একটি মেয়ে বললে, "না মা, আমাদের ঘরে ওই বালাইটি নেই কখনও! বুটুর-বাবা বলে, হোক্ ভৈরবের বাহন, কুকুর-টুকুর গুলো আমার দুচক্ষের বিষ!"

হেনা বললে, "আচ্ছা দাদা, বাচ্চাটি এই—এত বড় হয়েছিল, নয়?—আমাদের ওই ঘটিটির মতন উঁচু।"

দিদি ভাব্‌লে, কথাটা বুঝি তাকেই জিজ্ঞেস্ করা হচ্ছে।—বললে,

"কে জানে ত! ঘটির মতন না গাড়ুর মতন তোরাই জানিস্।"

পাঁক

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(দ্বিতীয় পর্ব্ব—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পটুলির ঘরের দরজায় পায়ে সুতো-বাঁধা হাঁসছুটো রাত্রে ঝুড়ি চাপা থাকে।

হঠাৎ সেদিন রাতে তাদের কি হল্লা—বুঝি বেড়ালেই ধরল।

সকাল হ'তে না হ'তে খোঁড়া বিষ্ণু ঘসড়ে ঘসড়ে চৌকাঠে বেরিয়ে চীৎকার—"ওগো দেখে যাওগো, সব্ব-নাশীর কাণ্ড কারখানা!" সঙ্গে-সঙ্গে কান্না—সে কান্না কি থামতে চায়! পাড়াশুদ্ধ উবুড় হয়ে এসে পড়ল। কিন্তু বোঝালে কি হবে?

গগন ধমক দিয়ে বল্লে, "কি হয়েছে তাই বল্ নারে বাপু—খালি কাঁদতেই ত' লেগেছিস্।"

"—তাই তখন আমি অমন সোমত্ত মেয়ে বিয়ে করতে চাইনি রে বাবা, সে বেটা ঘটক শালা শুন্‌লে না, আমার সাথে এই জুয়াচুরীটা করে দিলে বিয়ে দিয়ে…"

আবার কান্না—।

দামিনি-ঝি তার মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে বল্‌লে—

"আ মর্, হাবা মিন্‌সে, কি হয়েছে তোর ছেরাদ্দ তাই বল্‌না—!"

"আমি বলেছিলাম, দে একটা ছোট-খাটো দেখে—ছুঁড়ি-টুঁড়ি পাচ-পাচি মত তা' হলেই হবে, তা শুন্‌লে না শালা—টাকাগুলো নিয়ে দিলে এই সোমত্ত মাগীটার সঙ্গে বিয়ে রে বাবা……"

সঙ্গে সঙ্গে কান্না!

চারী গোলমাল শুনে সদ্য ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ রগড়াচ্ছিল, ব্যাপারটা তখনও ভাল করে তার হৃদয়ঙ্গম হয় নি।

সে হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল—"ওরে পটুলিরে—তোর সঙ্গে আমার অনেক দিনের ভাব যে রে—ওরে এমন করে কি কাঁদিয়ে যেতে হয় রে।"

"আ মলো ছুঁড়ির রকম দেখ—, তোকে আবার ভূতে পেল কেন রে বাপু!"

কিন্তু চারীর তখন শোক অশান্ত হয়ে উথলে উঠেছে—"ওরে পটুলিরে—কাল যে তুই আমার সঙ্গে হেসে কথা কয়েছিস্ রে—!"

পদ্ম ধম্‌কে বল্‌লে, "পটুলি কি মরেছে যে তুই তার জন্যে ঢাক পিটুছিস্।"

চারী অবাক্ হয়ে থেমে বল্লে, "এ্যা, তবে কি হয়েছে?"

সত্যিই ত! কি হয়েছে তা' হলে?

হাবা তখনও কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছে—

"আমি তখনই বলেছিলাম আমি খোঁড়া-হাবা মানুষ অত রূপ যৈবন সামলাতে পারবো না, আমার ছোট-খাটো থাঁদা-বোঁচা একটা হলেই হবে রে বাবা! সেই বেটা ঘটক—"

এবার গগন তার হাতটা ধরে হেঁচকা দিয়ে ঘুঁসি তুলে শাসিয়ে বল্লে, "কি হয়েছে বলবি না—"

হাবার আর সাড়া-শব্দ নেই, নীরবে ফিরে সে খোলা দরজাটার ভেতর দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে—।

কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

খোঁড়ার ঠেঙোটা দুখণ্ড হয়ে পড়ে ছিল বটে ঘরের মেঝেতে; কিন্তু তাতে কি বোঝায়?

গগন হাবার হাতটা ধরে আর-একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্লে, "ওই ভাঙা ঠেঙো আবার তোর পিঠে ভাঙব। কি হয়েছে পষ্ট করে বলবি কি না?"

এবার স্পষ্ট কথা বেরুল। —হয়েছে আর কি?

সর্ব্বনাশ হয়েছে! তলে তলে ও ডাকিনীর বহুদিন ধরে শলা পরামর্শ কার সঙ্গে চলছিল। বহুদিন থেকে বিষ্ণু তা সন্দেহ করেছে। কাল সে সরে পড়েছে। যাবার সময় ঝগড়া করে বিষ্ণুর ঠেডোটাও ভেঙে দিয়ে গেছে। সে আর আসবে না!

হাবার কান্না আবার অশান্ত হয়ে উথলে উঠল।

এইবার জটলা। কণে-বৌএর আসতে একটু দেরী হয়ে গেছল। এবার ভিড় ঠেলে সামনে এসে বল্লে, "আমি বাপু ন্যায্য কথা বলব, হাবা হোক্, খোঁড়া হোক্, সাত পাকের সোয়ামি ত বটে, তাকে ফেলে যাওয়াটা কি উচিত হয়েছে? বেশ ত ঘরে বসে দিব্যি বিবিটি সাজছিলি গুজছিলি,— কেউ কি কিছু বলতে গিয়েছিল, না কেউ বলতে পারে?—তার ওপর এ ঢলানি কেন? বলুক না সবাই কথাটা ন্যায্য কিনা!"

নেয্য ত বটেই—।

কণেবৌ এবার বিষ্ণুকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, "তুই বা বুড়ো মিন্‌যে হাউ হাউ করে কেঁদে মরছিস্ কোন্ লজ্জায়? হাবা হোস্ খোঁড়া হোস্ কাচা দিয়ে কাপড় পড়িস্ ত বটে! তবে আবার ভাবনা কিসের র‍্যা? একটা গেছে অমন পাঁচটা পাবি—"

হাবা চটে গেল এবার—"যা নয় তা! পাঁচটা পাবি, পাঁচটা পাবি! বৌ অমনি পথে ঘাটে ছড়ান রয়েছে কিনা, এইত সব বেচেকিনে চার কুড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে করেছিলেম, রইল আমার কপালে! তুমি যাও বাপু, আমি বলে নিজের জ্বালায় মরি, উনি এসে করছেন,—পাঁচটা পাবি, পাঁচটা পাবি!"

এ অপমানের জবাব কণে-বৌ দিত, কিন্তু গগন মাঝে থেকে ধমকে উঠল—"চুপ সব। কোঁদল করবার আর সময় পেলনা!"

সবাই চুপ। গগনের কথা অগ্রাহ্য করা নিরাপদ নয়। গগন এবার হাবার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "কার সঙ্গে গেল?"

তা যদি জানত হাবা, তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল?

"গেছে যে তাই কি করে বুঝলি?"

"যায়নি আবার!"—হাবা উত্তেজিত হয়ে উঠল। "দুপুর রাতে জানলায় খুট্টুর খাট্টুর শব্দ। দুবার শুধোলুম, 'কিসের শব্দ?' বলে,—'কিসের আবার? ইঁদুর বেড়ালের!' আমি হাবা বলে আমায় জল বুঝিয়ে দিলে আর কি? ইঁদুর বেড়াল গুণে গুণে টোকা দেয়! সে কথা বলতে বল্লে, 'গরজ থাকে নিজে উঠে দেখনা।' আমার বাপু রাত বিরেতে ভয় করে! খ্যাক্ করে যদি গলাটাই ধরে টিপে! বল্লাম,—'উঠ্‌তে হবে কেন? আমি সব বুঝি!' এই আর কোথায় আছে! চোখ রাঙিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বল্লে কিনা, 'কি বুঝিস্ কি? আমার লোক এসেছে, না?—এসেছেই ত, এই চল্লাম আমি তার কাছে, কি করতে পারিস, কর দেখি তুই? বলে' ঝণাৎ করে খিলটা খুলে ফেল্লে!"

বিষ্ণু একবার বিস্মিত দৃষ্টিটি সকলের ওপর বুলিয়ে গেল।—"আবার শুধু তাই? ঠেডোটা ছিল দেয়ালে ঠেসান দেওয়া; সেটা দু'হাতে মুচড়ে ভেঙে বল্লে—'মুরদ নেই এক কড়ার, রাত দিন ঘ্যানর ঘ্যানর! থাক্ অথব্ব হয়ে বসে। আমি গেলে কত সুখভোগ করিস্ দেখি।—বলে' বেরিয়ে গেল একেবারে!"

"তবে হাঁসগুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন?"

"রাগের চোটে মড়মড়িয়ে ঝুড়িটা মাড়িয়ে গেল না!"

হিন্দুস্থানি বুড়োও কখন্ ভিড়ের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে, বল্লে,—"অমন যায়। মেয়ে মানুষ জাতটাই অমনি! গলায় ছুরি মারেনি ত, তা হলেই যথেষ্ট!"

বিদেশী কথা, কেউ বুঝল কেউবা বুঝল না।

পদ্ম চলে গেল! যেতে যেতে বল্লে, "এদিকে কত বেলা হোল তার হিসাব আছে, ওই ছেঁড়া কথা নিয়ে দিন ভোর কাটবে?"

বেলা তখন সত্যিই হয়েছে।

ডকের মিস্ত্রি মজুররা কখন বেরিয়ে গেছে।

গগন বল্লে, "রোসো, রোসো, এর একটা বিহিত করতে হবে না?"

হাবার শোক আবার উথলে উঠ্‌ল।—"এর কি বিহিত করবে গো! তার মনে এই ছিল তা কে জানত?"

পলকের মধ্যে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। ঝড়ের মত ভিড় ঠেলে এসে পটলি সজোরে হাবার চুলের মুঠি ধরে মেজের ওপর মাথাটা বার, বার ঠুকে দিলে।—"আমি কোথায় গেছিরে মুখপোড়া ওলাউঠো, সক্কাল বেলা পাড়া শুদ্ধু ডেকে কেলেঙ্কারী সুরু করেছ! কোথায় আমি যাব শুনি ঘাটের মড়া, তোর মুখে নুড়ো জ্বালাবে কে তা'হলে?"

কপালটা ফুলে ঢিবি হয়ে উঠ্‌ল। পট্‌লি এবার স্বামীকে ছেড়ে সবার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"—ঘরের দরজায় কিসের ভিড় গা! তামাসা পেয়েছ, না? ভালয় ভালয় সরে পড় বলছি, নইলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে সব বিদেয় করে দেব।"

সে চোখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি!

একে একে সব্বাই সরে পড়ল। কে একজন বল্লে, "বাবা, মেয়ে নয়ত কেউটে সাপ্!"

গগন তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। পট্‌লির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে একটু হেসে কি একটা কথা বলতে গেল।

পটলি চোখ রাঙিয়ে বল্লে, "নেমে যাও বলছি, দস্তুর মত ভাড়া দিয়ে থাকি। এখানে কারো খাতির রাখব না।"

কথাটা যেন তাঁকে বলাই হয়নি। গগন আর একবার হাসবার চেষ্টা করলে। পট্‌লি হাত দিয়ে উঠোনটা দেখিয়ে রুক্ষস্বরে শুধু বল্লে, "নেমে যাও।"

গগন মুখ চোখ রাঙা করে নেমে গেল!

দূরে দাঁড়িয়ে কার আর দেখতে বাকী রইল!

... ...

লাল সীমেন্ট-করা রকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রাণী পা দোলাতে দোলাতে সুর করে পড়ে,—"A frog can hop—একটি ব্যাঙ্‌ পারে লাফাইতে।"

থেকে থেকে গান হয়। মহাদেবের যাত্রার আখড়াটা মাঠে মারা যায়নি দেখা যাচ্ছে। রাণীর সব গানগুলি কণ্ঠস্থ।

গগন এসে জিজ্ঞাসা করে, "তোর মা কোথা?"

"মা?—মা গঙ্গা নাইতে গেছে!"

গগন চটে যায়। "ফের গেছে গঙ্গায়, বুজরুকি যে দিন দিন বেড়ে চল্ল দেখি। পুকুরে নাইলে আর দেহ শুদ্ধ হয় না!"

পদ্ম ফিরে এসে তুলসীতলায় জল দেয়।

গগন বল্লে, "অত পুণ্যি একা বইতে পারবে না, আমায় একটু দিও!"

পদ্ম কথা না কয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

গগন একটু হেঁকে বলে, "একেই বলে ঢঙ্!"

হিন্দুস্থানী বুড়ো তার ঘরের চৌকাঠে বসে বলে,—"বুড়ো হলে হয়, অমন ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি হয়! রক্ত ঠাণ্ডা হলে ভয় আসে কিনা!"

লোকটাকে কেমন গগনের পছন্দ হয় না। কথাগুলো যেন কেমন বেঁকা বেঁকা! তবু জিজ্ঞাসা করে, "কিসের ভয়?"

—কিসের ভয়?—লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে গগনের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—"প্রাণের ভয়! মরবার ভয়!"

গগন বলে—"ছাই! গঙ্গায় নাইলে বুঝি আর মরতে হবে না?"

বুড়ো কথা কয় না। একটু যেন হাসে।

... ...

কারণ যাই হোক্ পদ্মর ধর্ম্মকর্ম্ম যে বড্ড বেড়েছে এটা ঠিক্।

গগন বলে, "কই এতদিন কি আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিল? এই হেন ঠাকুর এই তেন ঠাকুরের পূজো ত তখন করিনি! ঠাকুর ঘর ত ঠাকুরের গুদাম হয়ে উঠ্‌ল।"

পদ্ম শুধু বলে, "হোক্!"

গগন বলে, "হোক্ না খুব, হোক্ কিন্তু ওই বেটা বামন লুটে নেয় কেন?"

পদ্ম জবাব না দিয়ে উঠে যায়!

শুধু কি ঠাকুর ঘর আর বামন!

ভোর না হতে খোল করতাল বাজিয়ে বোষ্টম আসে। দু'বার খোলে ঘা দেয় কি না দেয়, পয়সা দু'টি নিয়ে চলে যায়, আবার সঙ্গে দুটি বিড়ি!

মাস-কাবারি সিধের বহরটি গগন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—তারপর বলে, "শগ্‌গে কত করে কাঠা?"

... ...

এততেও পদ্মর হয় না, বলে, "মাসে মাসে বারটি করে ব্রাহ্মণ খাওয়াব।"

গগন এবার সত্যি অবাক হয়ে যায়—বলে, "তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি?"

পদ্ম অটল।

গগন বলে,—"ঢের সয়েছি, এবার আমি কুলুক্ষেত্ত করে তুলব।"

বিস্তর কথা-কাটাকাটি হয়। শেষে গগন বলে, "তাহ'লে তোমার ধনসম্পত্তি নিয়ে তুমি থাক, আমি চল্লুম! এযে বামুন-কায়েতের বাড়া করে তুললে!"

বারো জন বামন খাওয়ান হয় না, কিন্তু পদ্মর বাড়াবাড়ি কমে না।

মাথায় তেল দেওয়া উঠে গেল। রুক্ষ মাথায় গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসে। একদিন নেয়ে এসে কাপড় ছাড়ে না। এক কাপড়েই থাকবে।

আলাদা উনুন পাতা হল। এক বেলা নিজে রেঁধে খাবে!

গগন আর কিছু বলে না!

কণে-বৌ বলে, "ধোপানি বুড়ো-বয়সটায় চলাল না!"

... ...

পটলি একদিন এসে বল্লে, "আমি তোমার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাব দিদি!"

পদ্ম বল্লে, "বেশ ত!"

কণে বৌ বল্লে—"ধম্মপথে এইবার জুটি মিল্‌ল ভাল!"

ক্রমশ

বিচিত্রা

গত বৈশাখে প্রবাসীর বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল।

এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রতিকূল বাধা বিপত্তির মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশের আয়োজনে, বাংলার-নব চিত্র-কলার অপরূপ সৃষ্টি সাধনায় প্রবাসী যে-ভাবে যতখানি সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি।

ভবিষ্যতের দিনে প্রবাসীর সম্পর্কে মনের ভাণ্ডারে এম্‌নি ধারা আনন্দের স্মৃতি যাহাতে আরও বেশি করিয়া সঞ্চিত হয়, তাহারই জন্য একান্ত ভাবে কামনা করি।

* *

*

বৈশাখের প্রবাসীখানা হাতে লইয়া অনেক কথাই মনে আসিতেছিল। দু'চারিটা তার বহুকাল ধরিয়া বহুবার এম্‌নি মনে হইয়াছে। যখনই ভাবিয়াছি তখনই

ব্যথা পাইয়াছি। 'মনে হয় এই অভিনন্দন-লিপির সঙ্গে আজ সেগুলি সসঙ্কোচে বলিবার দিন আসিয়াছে।

* *
*

একথা খুবই সত্য যে রবীন্দ্রনাথের অনুপম রচনা-সম্ভার মাসের পর মাস বক্ষে ধারণ করিবার গৌরব অর্জ্জন করিয়া ধন্য হওয়া ব্যতীত এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলার বহু ভাল লেখকের ভাল ভাল লেখা প্রবাসী প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও না বলিয়া উপায় নাই, যে আধুনিক বাংলায় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পূজারী যাঁরা, তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রতিভার সম্যক মর্য্যাদা এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে প্রবাসী ঠিক যেভাবে উচিত সেভাবে একেবারেই দিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস সযত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বিস্তারিত বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির অনবদ্য সৌন্দর্য্যের ও অপরিসীম গভীরতার পরিচয় দিবার চেষ্টা বা ব্যবস্থা—কোনটাই আজ পর্য্যন্ত প্রবাসী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাংলার বহু বহু সাহিত্য-রসিক নর-নারী যাঁহার রচনা-পাঠে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত, তাঁহার একটি চিত্র আজও বাংলার 'সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকায়' একটুখানি গৌরবের আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না! শুধু তাই নয়, তাঁহার 'মহেশের' মত নিরীহ, 'সুবোধ, সুশীল' গল্পখানিরও পিয়ার্সন-কৃত ইংরাজী অনুবাদ মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকা হইতে অমনোনীত হইয়া ফেরৎ আসে!

এই বাংলা দেশেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে যে একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক আছেন, ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহুল প্রচারিত, বহু শিক্ষিত জন-মণ্ডলী সমাদৃত বাংলার এই সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রখানি হইতে তাহার কোনও বিশদ পরিচয়ই পাওয়া যাইবে না। বোধকরি তাঁহার সকল রচনাই মানুষকে ক্রমশ বলহীন করিয়া তার আত্মোপলব্ধির পথে ক্রমাগত সুবিপুল বাধাই জড়ো করিয়া তোলে!

নজরুল ইস্‌লামের কবি-প্রতিভা ত আজিকার দিনে প্রবাসীর কাছে একটা বিরাট ব্যঙ্গ ও পরিহাসের সামগ্রী! প্রবাসীর মূল্যবান পত্রে এই তরুণ কবির রচনা-প্রকাশ বোধকরি প্রবাসীর পক্ষে—শক্তি, সময় ও অর্থের অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

* *
*

বাংলা সাহিত্যের নবসৃষ্টির সাধনাকে ঠিকমত চিনিয়া লইয়া পরম উৎসাহে তাহাকে দিনে দিনে আরও সুন্দর ও অপরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে সহায়তা করিবার মত শক্তি ও উদারতা প্রবাসীর বড় একটা নাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষের ও বিশ্বের জটিল বিচিত্র জীবনধারাকে সকল দিক্ দিয়া চিনিবার, জানিবার, বুঝিবার দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা ও দুঃসাহসিক প্রয়াস প্রবাসীর দেখি না। তাই অনেক সময়ই প্রবাসী-পরিচালনায় জীর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতার দুঃসহ প্রাদুর্ভাব মনকে পীড়া দেয়।

শুধু যে এই একটি কারণ তা নয়;—আরও কয়েকটি কারণে প্রবাসীর প্রতি তরুণ সাহিত্যিকমণ্ডলীর পূর্ব্বের সে সশ্রদ্ধ অনুরাগ আর তেমন-ধারা নাই। যে-সব শক্তিমান তরুণ সাহিত্য-সেবী প্রবাসীতে লেখা পাঠান, প্রবাসীর সঙ্গে অন্তরের প্রীতির সম্বন্ধ তাঁহাদের কতটা আছে তাহা আজ ঠিক করিয়া বলা একান্ত কঠিন। নিতান্ত বাহিরের প্রয়োজনেই প্রবাসীর সিংহ-দ্বারে তাঁহাদের গিয়া দাঁড়াইতে হয়। গত ১৩৩০ হইতে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তরুণ সাহিত্য-সেবীদের বিচিত্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা আছে, তাঁহারাই এই কথার যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন।

* *
*

শুনিতে পাই, ক্রমশ-প্রকাশ্য গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে কাগজে-কলমে কোনও কথা লিখিতে যাওয়া সাহিত্য সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির একেবারে বাহিরে।

—কিন্তু মনের মধ্যে কথা ত জমে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সে-সব কথা লইয়া আলোচনাও ত করি, আর সেইগুলি সাজাইয়া-গুছাইয়া অক্ষরে ফুটাইতে গেলেই যত অমার্জ্জনীয় অপরাধ! সমসাময়িক ধারাবাহিক সাহিত্য অথবা আধুনিক সাহিত্যের বহুমুখী ধারা লইয়া নিছক জল্পনা-কল্পনার কি কোনও মূল্যই নাই?

* * *

কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' সম্বন্ধে সাহিত্য-শাস্ত্রীর এ কঠোর অনুশাসন এখন আর বোধকরি ঠিক মত খাটে না। 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি যাঁহারা এ-পর্য্যন্ত বঙ্গবাণী-পত্রিকায় পরম আগ্রহ সহকারে পড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও উৎসুক মন বোধহয় আজ আর জল্পনা-কল্পনার স্বপ্নলোক হইতে বিস্ময়-তৃষিত নেত্রে ঔপন্যাসিকের মানস-লোকে উঁকি-ঝুঁকি মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে না, আজ তাঁহাদের চেতনা ও অনুভূতির জাগ্রত-লোকে সুমিত্রা ও সব্যসাচী, অপূর্ব্ব-ভারতী, কবি ও নবতারা সকলেই নিতান্ত পরিচিতের মত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আশে-পাশের আপনজনের কাছে নিজেকে যেমন বারে বারে আলাপে-আনন্দে সহজ করিয়া, পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া পাই, উপন্যাস-লোকের এই অবাস্তব অধিবাসীগুলিকেও তেম্‌নি নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। একান্ত পরিচিতের মত তাহারা কাছে আসে, কথা কয়, আনন্দ দেয়।

* * *

'পথের দাবী' যখন প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুনিয়াছিলাম, এখানি একখানি 'পলিটিক্যাল' নভেল হইবে। হয়ত হইয়াছেও তাই। কিন্তু সে কথা আজ থাক্।

'পথের দাবী'র বিচিত্র জটিল চরিত্র সৃষ্টির কথাও এখানে তুলিব না। সব্যসাচীর চরিত্রের পরিকল্পনায় কৃতিত্ব অধিক, অথবা আর্টিস্টের অপূর্ব্বর চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার রূপদক্ষতার পরিচয় বেশি, সে অযথা তর্কের নিস্ফল বিচারও এখানে সুরু করিব না।

আজ স্মরণ করিব কেবল সব্যসাচীর জীবনকে চিনিবার, মানুষকে বুঝিবার গভীর সহজ পরমাশ্চর্য্য দৃষ্টিটিকে। আজ অনুভব করিব ভারতবর্ষকে লইয়া তাঁহার অন্তরের অফুরন্ত বেদনা ও অনির্ব্বাণ দাহের অন্তরালে ভারতী ও অপূর্ব্বকে লইয়া তাঁহার গোপন, প্রশান্ত আনন্দটিকে।

—ধরিত্রীর বুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষের এই অবিরাম অক্লান্ত অপচয়ের মধ্যেও মানুষ মানুষকে ভালবাসে,—সেই-ভালবাসার প্রস্ফুটিত রূপ, আজিও দেশে দেশে অনাঘ্রাত অনাদৃত নির্য্যাতিত হইলেও,—চেনা সহজ।

কিন্তু যাহা আজও ফুটিয়া ওঠে নাই, অথচ ফুটিবার অপেক্ষায় অজানিতে সঙ্গোপনে দিনে দিনে আকুল হইয়া উঠিতেছে, আগে হইতে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সানন্দে বরণ করিয়া লইবার সাধনা সব্যসাচীর কোথায় কবে কেমন করিয়া শেষ হইল তাহাই ভাবি।

অন্তরে যে সত্যের অস্তিত্ব মানুষ নিজেই জানে না, অথবা জানিলেও প্রবল ভাবে অস্বীকার করিতে চায়, তাহাকেই সুদূরের জ্যোতির্ম্ময় সম্ভাবনা হইতে চিনিয়া চিনাইবার প্রয়াস বারে-বারে সব্যসাচী কেমন করিয়া করেন তাহাও ভাবি।

অনাগত ভবিষ্যতে ভারতী-অপূর্ব্বর মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া, দারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা সব্যসাচী কেমন করিয়া দিয়া যান, দিকে দিকে ভালবাসা ও মানবতার নিষ্করুণ কদর্য্য অবমাননার মধ্যে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহাই দেখি।

মুরলীধর বসু

* *
*

কলিকাতায় মাসব্যাপী যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গেল তাহাতে নাকি হিন্দুরও চোখ ফুটিয়াছে, মুসলমানেরও চোখ খুলিয়াছে।—অর্থাৎ বাঙ্গলার হিন্দু রাজনীতিকরা আর মুসলমানদের দলে টানিয়া রাখিবার গরজে জোড়াতালির পথে পা' বাড়াইবেন না; এদিকে মুসলমানরাও খাঁটি মুসলমান হইবেন, অর্থাৎ মুসলমানদের স্বার্থই আগে দেখিবেন—স্বরাজের লোভে আর হিন্দুদের 'ভাই' বলিয়া ডাকিবেন না।

* *
*

ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় মুসলমান কোন্ অংশ যে গ্রহণ করিবেন, তাহা ভবিতব্য জানেন। তবে ভারতবর্ষকে চরম ও পরম বলিয়া ভারতের মুসলমানরা যদি গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভারতের এত বড় দুর্গতি দূর করিবার দাওয়াই ভারতবাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।—কারণ সে-ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয়তা মুসলমানদের 'পরদেশী' 'পরগাছা' বলিয়াই দেখিতে বাধ্য হইবে, জাতীয়তার সঙ্গে কোন বিজাতীয়তার আপোষ একেবারেই অসম্ভব—এই ধরণের গোঁজামিলের পথকে পরিহার করিয়া চলা ভিন্ন জাতীয়তার ভাবে প্রবুদ্ধ ভারতের অন্য পথ নাই। ভারতের জাতীয়তার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, ভারতের হিন্দুর মনে ভারতের বাহিরের কোনও চেতনা আজ আর বড় হইয়া নাই। টিলকের Arctic Home in the Vedas এর,—উত্তর মেরুর আর্য্য-সন্তান বলিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি আজ আর হিন্দুর নাই। হিন্দু ভারতবর্ষকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমান আজিও ভারতবর্ষকে আরব্য বা তুরস্ক হইতে আপন করিয়া তুলিতে পারে নাই।—তাই ভারতের দাবী তাঁহার কাছে তেমন সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, যেমন তুরস্কের দাবী সত্য হইয়া ওঠে।—উঠে বলিয়াই বিদেশী তুর্কী ফেজ পরিয়া সে যেমন স্বধর্ম্ম ও স্বাজাত্যের সান্নিধ্য অনুভব করে, ভারতের পোষাকে তেমন করে না।—মুসলমানকে এই বৈদেশীক প্রভাব হইতে মুক্ত করা ভারতের জাতীয়তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।—স্বাদেশিকতার ভাবে জাগ্রত কাবুল তুর্কী ফেজ ব্যবহার করা জাতীয়তার অবমাননা মনে করে।—এদিকে কামাল পাশা একজন খৃষ্টান তুর্কবাসীকে আপন মনে করেন, কিন্তু একজন মুসলমান ভারতবাসীকে বিদেশী মনে করেন—আপন মনে করেন না। আমাদের ভারতের মুসলমান নেতারা কিন্তু সর্ব্বপ্রথম মুসলমান হইতে সাধ্য-সাধনা করেন, পশ্চাৎ ভারতবাসী। কামাল পাশার দেশাত্মবোধের ইঙ্গিত আমাদের মুসলমান নেতারা গ্রহণ করিলে ভারতের রাষ্ট্র সমস্যার অনেকখানি মীমাংসা হইত। এই দেশাত্ম-বোধের প্রশস্ত ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিলে, ভারতবাসীর চেতনায় সকলকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে, হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইবে। কলিকাতায় যে দাঙ্গা হইয়াছে, তাহা তেমন মারাত্মক নহে, যত মারাত্মক ভারতেরই মাটিতে ভারতের জাতীয়তার পরিপন্থী এই বৈদেশিক বহির্মুখীন্ আগাছা—পরগাছার উদ্ভব।

* *
*

হিন্দুর মুসলমানদের মত বহির্মুখীন্ মতিগতি নাই সত্য। থাকার উপায়ও নাই। কিন্তু হিন্দুর ঘরে জাতীয়তার বিরোধী কালসর্প রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, জাতিভেদের আধুনিক ব্যাভিচার। এই শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে জাতীয়তার স্পর্শে এক করিয়া তুলিতে হইবে। হিন্দুর কাছে, ভারতের জাতীয়তার কাছে ইহা সমস্যা।

* *
*

কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সম্পর্কে মৌলানা

সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি যে 'গরম' উক্তি করিয়াছেন, তাহা মুসলমানকে সুখী করিয়াছে, হিন্দু রাজনীতিকদের আধ ফোটা চোখ ভাল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে। আলি ভাইদের হুম্‌কির মূল্য যে বেশী কিছু নহে তাহা আলি ভাইরাই সব চাইতে বেশী জানেন। কিন্তু যে কথাটা তাঁহারা জানেন না, তাহা এই,—ইংরেজকে ঘুষ দিয়া যেমন স্বরাজ পাওয়া যায় না—তেমনি মুসলমানদের ঘুষ দিয়াও স্বরাজ-সংগ্রামের দোসর করিয়া রাখা যায় না,—সুতরাং ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় মুসলমানদের টানিয়া আনিবার লোভে, মুসলমানকে খিলাফতের ঘুষ, প্যাক্টের ঘুষ দেওয়ার ফলে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অতীত যে ভারতবর্ষ রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পায় নাই; তাই আজ প্রবুদ্ধ ভারত, ভারতের জাতীয়তা-কেই চরম ও পরম বলিয়া গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিতে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছে, জাতীয়তার বিরোধী কোনও আবদার—সে আবদার হিন্দুরই হউক, মুসলমানেরই হউক, রাস্তার বাজনা বন্ধ করার আবদারই হউক বা মুসলমানের কোরবাণী বন্ধ করার আবদারই হউক,—জাতীয়তার মুখ চাহিয়াই তাহা অগ্রাহ্য করিবে। এই সুষ্ঠু চেতনা আজ দেখা দিতেছে এবং দিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস—আলি ভাইরা একথা জানিয়া রাখিবেন।

* * *

বাঙ্গলার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স এবার কৃষ্ণনগরে হইয়া গেল। অসহযোগের সূত্রপাত হইতে বাঙ্গলার চিন্তা-শক্তির দাসত্ব চলিয়াছিল। বাঙ্গালী যাহা বিশ্বাস করে নাই, তাহাও বাঙ্গালী প্রকাশ করিবার ভরসা পায় নাই। অহিংসায় বিশ্বাস না থাকিলেও অহিংসার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছে, করিতে হইয়াছে; আত্মিক-স্বরাজের, উপনিষদের স্বরাজের বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিলে তাহাকে আধ্যাত্মিক দুর্ব্বুদ্ধির দায়ে 'পতিত' হইতে হইয়াছে। অর্দ্ধ বিশ্বাসে অর্দ্ধ উৎসাহে বাঙ্গালী জোড়াতালির পথে আজ যে অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছে, সেখান হইতে যে বাঙ্গালীকে ফিরিতেই হইবে—সৌভাগ্যবশে বাঙ্গলার মনেই সেই প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ভাব স্বতঃ জাগিয়াছে।—চিন্তার দাসত্বের, কর্ম্মের দাসত্বের সেই প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহ এবারের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।—মতকে পথকে যাচাই করিবার মত সুস্থ মন কৃষ্ণনগরে কথঞ্চিত প্রকাশ পাইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা জেলা কন্‌ফারেন্সেও যাচাই করিবার মত সুস্থ মন—তাজা মন—বাঙ্গলার যুবক-শক্তি দেখাইয়া ছিলেন। জীবনের এই প্রকাশ-ভঙ্গিকে আমরা আজ প্রাণের আনন্দে বরণ করি।

* * *

সিরাজগঞ্জে যে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট তৈরী হইয়াছিল, তাহাতে করিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ত সম্ভব হয়ই নাই, বরং বাঙ্গলার মাটিতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান কতগুলি চাকুরী পাইবে, কত সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব তাহার হাতে আসিবে, তাহা লইয়া জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু এই প্যাক্টের মারফতে, সাম্প্রদায়িক বাঁদরামীর বাটুখাড়ায় যে প্রতিনিধিত্ব ও চাকুরী বণ্টনের ব্যবস্থা তাহাতে ছিল, তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনাই বড় হইয়া উঠে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে যে জাতীয়তা বর্ত্তমান—যেখানে আমাদের সকল জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে,—সেখানে আমাদের বুদ্ধি স্থিতি লাভ করে না। হিন্দু-মুসলমান কলহ করুক, কিন্তু তবু তাহাকে এই জাতীয়তার পথেই মিলিতে হইবে। এই জাতীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোনও প্যাক্ট করিতে নাই, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের আবর্জ্জনা বাড়াইয়া তুলিতে নাই। তাই সিরাজগঞ্জের ভুল কৃষ্ণনগরে শোধ-

রাইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্যাক্টের জোড়াতালিতে কাহাকেও দলে রাখার দুর্গতি আমাদের ছাড়িতেই হইবে, জাতীয়তার প্রশস্ত পথে যদি মিলন অসম্ভব হয়, তবে মিলনের আর কোনও সঙ্কীর্ণ পথ আমরা খুঁজিয়া বাহির করিব না। কারণ সত্যিকার মিলনের অন্য পথ নাই।

* *
*

কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্সে এবার যে প্যাক্ট বাতিল হইবে, এমন আশা ও আশঙ্কা অনেকেই করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইয়াছে। যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কন্‌ফারেন্স ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা প্যাক্ট বাতিল করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে যে মতান্তর ও মনান্তর আত্ম প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেশের পক্ষে বর্ত্তমানে ক্ষতিকর, কিন্তু তবু চিন্তা ও কর্ম্মের দাসত্ব ও অবসাদ হইতে এই জ্যান্ত অভিযানকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

* *
*

প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শাসমল এনার্কিষ্টদের সম্বন্ধে কতগুলি আপত্তিজনক কথা বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। নিষ্প্রয়োজনে বিপ্লব-বাদীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি এই সকল উক্তি—অত্যুক্তি না করিলেই পারিতেন।

এই উক্তির প্রতিবাদে কন্‌ফারেন্স যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহেন, শ্রীযুক্ত শাসমল তাহা অনাস্থা প্রস্তাব মনে করিয়া সভাপতির আসন ত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত শাসমলের পক্ষে অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু তাঁহার উক্তিকে যাঁহারা অন্যায় মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও তীব্র প্রতিবাদ প্রস্তাব আনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শাসমলের অভিভাষণে বিপ্লবপন্থা, হিংসা, অহিংসা প্রভৃতির একটা খিচূড়ী করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রনীতিক পন্থা নির্দ্দেশে এই ধরণের হেঁয়ালীর স্থান নাই। এইরূপ রাষ্ট্রনীতিক আধ্যাত্মিক গবেষণা এদেশ হইতে যত সত্বর দূর হয় ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত শাসমলের অভিভাষণ পড়িয়া মনে হইল, ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা নাই। ধারণা নাই বলিয়াই কোন যথার্থ মতকে তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কেবল বাজে ও অবান্তর কথায় অভিভাষণের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

* *
*

কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্স যে ভাবে শেষ হইল, তাহাতে মনে হয়, স্বরাজ্য দলের মধ্যেও অতঃপর দলাদলি চলিবে। স্বরাজ্য দলের হাত হইতে কংগ্রেস ক্রমে সরিয়া যাইবে কিনা, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না—দল হিসাবে স্বরাজ্য দল প্যাক্টের পক্ষে না থাকিলেও প্যাক্ট নাকচ করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণনগরে দেখা গেল অধিকাংশ প্রতিনিধিই প্যাক্ট বাতিল করার পক্ষে। দেশবন্ধুর যে ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসপন্থীদের প্যাক্ট মানিতে বাধ্য করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিত্বের অভাবে, আজ কংগ্রেস কর্ম্মীরা শুধু স্বরাজ্যদলের নেতাদের বিরুদ্ধেই ভোট দিতে উদ্যত হন নাই, বিদ্রোহ করিতেও দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পরিণামে, স্বরাজ্যদলের শক্তিহানি অনিবার্য্য। তাহার অর্থই বাঙ্গালার শক্তিশালী রাজনীতিক দলের শক্তিহানি। তবে যাঁহারা বিদ্রোহের স্বর তুলিয়াছেন, তাঁহারা যদি শক্তিশালী দলে পরিণত হইতে পারেন তবেই রক্ষা নতুবা, ভাঙ্গিবার কৃতিত্ব ইঁহাদের থাকিলেও গড়িবার গৌরব যে ইঁহাদের নাই দেশবাসী একথা বলিবেই। স্বরাজ্যদলের ভাঙ্গাহাটে মধ্যপন্থী বা ন্যাশন্যালিষ্টদের শক্তি-সৌধ গড়িয়া উঠিবে এমন দুরাশা যেন কেহ পোষণ না করেন। এর পর মুসলমানগণ কংগ্রেস রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবেন। মুসলমানদের অস্তিত্বের অভাবের

অজুহাত দেখাইয়া ইংরেজেরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অযোগ্যতা ঘোষণা করিবেন। মুসলমানরা যখন দলে ছিলেন তখনো অবশ্য তাঁহারা অন্যরকম অজুহাত (যথা মুষ্টিমেয় স্বরাজ্যদলের• কেনা ইত্যাদি) দেখাইয়াছেন, সুতরাং ইংরেজের অজুহাত বেদবাক্য নহে ইহা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রনীতিক রফা করার প্রয়োজন যদি কখনো ইংরেজ বুঝেন তাহা হইলে, এ সকল অজুহাতের কথা তাঁহারা আমলেও আনিবেন না।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ।

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

(কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সৌজন্যে)

কালি-কলম

১ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৩ সাল [৩য় সংখ্যা

ফের যদি ফিরে আসি—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ফের যদি ফিরে আসি
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে
কিম্বা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দুপহরে
কিম্বা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,—
নূতন ধরণী পরে কারেও কি পারিব চিনিতে
কাহারেও পড়িবে কি মনে ?
এ জীবনে যাহাদের ভালবাসিয়াছি
আজ ভালবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা ?
—পারিব চিনিতে ?

জন্ম ল'ব হয়ত সে
কোন্ ঊর্ম্মি-ছন্দময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিম্বা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে,
কিম্বা——কোথা কিছু নাহি জানি!

এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি ?
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আরবার,
সেদিন কি এমনি ফুটিবে ফুল
এইমত তৃণ
জাগিবে কি পদতলে,
এইমত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময় ?

পড়িবে কি মনে
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিল ভালো
এই ধরণীর পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি
ভালো বাসিয়াছি ?

যে মুকুল আশাগুলি রেখে যাব আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অসমাপ্ত,
তাহাদের সাথে আর
হবে ফিরে দেখা ?
এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হ'ল নাকো
যত খেলা রয়ে গেল বাকি
ফিরে আর পাব তাহাদের ?

আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয় ?

যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে,
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া
"আমারে ভুলিয়া-ছিলে কেমন করিয়া ?"

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্ব্বজনে
সকলেরে ভালোবেসে—ভালোবেসে সব কিছু
দুর্দ্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন
চলিতে পাব কি দুইজনে
এক সাথে ?

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে ;
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি ;
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয় !

পুরাতন ভৃত্য

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

বিশ্বেশ্বর যাজক ব্রাহ্মণ—তাঁর যত যজমান সবই নমঃশূদ্র। তাঁহার শিষ্যরা শুষ্কমাত্র আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়াই ঠাকুরকে তৃপ্ত রাখে না, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভক্তির সঙ্গে আরো যাহা দেয়, ভক্তির চাইতে সংসারে তার ঢের বেশী আদর এবং প্রয়োজন।

ঠাকুরের মারফত শিষ্যরা পারত্রিক মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে কিনা তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন যাঁহারা অন্তরীক্ষে থাকিয়াও মানুষের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। বিশ্বেশ্বরের নিজেরও যদি সে খবরটা জানা না-ও থাকে, তবু সে-অজ্ঞতা পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে দেনা-পাওনার আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতে আজ পর্য্যন্ত পারে নাই। বিশ্বেশ্বর যাহা দান করিতেন তাহার সারবত্তা ও সার্থকতায় সংশয় থাকিলেও বুঝি থাকিতে পারে, কিন্তু

যাহা গ্রহণ করিতেন সংশয়ের ঘুণ প্রবেশের মত দৌর্ব্বল্য তাহার অঙ্গে থাকিতে পারে না।—

বিশ্বেশ্বরের প্রাপ্তি প্রচুর হইলেও, বাহিরটা দেখিয়া মনে হয়, যেন সঞ্চয় প্রচুর হয় নাই। যাজক ব্রাহ্মণ চির-দরিদ্র, এ-টা একেবারে প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য—কারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দানে তুষ্ট কর, চাহিদার মূলমন্ত্রই ঐ। লোকে দেখিত, যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া ছোট্ট দু-আনিটি পর্য্যন্ত তার জ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে একেবারে দেউলিয়ার হাটে বসাইয়া দিয়া, নিরুদ্দেশ হইয়া যায়,—বিশ্বেশ্বর প্রাণপণ করিয়াও ঐ চঞ্চল বস্তগুলিকে আটকাইতে পারেন না; তাই তাঁর এত বাজার-দেনা।

কাজেই যখন স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী স্বর্গারোহণ করিলেন তখন বিশ্বেশ্বরকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল।—

নামাবলী, টিকি এবং পৈতা, এরা বাহ্যিক একটা নির্জ্জীব সরঞ্জামমাত্র, ব্রাহ্মণীর শ্রাদ্ধের খরচ তোলা একা তাহাদের সাধ্য নয়; বিশ্বেশ্বর তাই জিহ্বাগ্রে সাজাইতে সাজাইতে চলিলেন শব্দব্রহ্মকে—যাহা উচ্ছন্নে পাঠাইতে পারে, রাজা করিতে পারে, এমন-কি অপুত্রককে পুত্র দিতে পারে; মন ভিজাইয়া টাকা আদায় করিতে ত' পারেই। মজুত তহবিল হইতেই বিশ্বেশ্বর শ্রাদ্ধের খরচটা অক্লেশেই দিতে পারিতেন; কিন্তু এটা যে বড় জানা কথা যে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভিক্ষায় ব্রাহ্মণের লজ্জার কারণ তেমন নাই, আর তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। শূদ্রের পুণ্যলাভের লোভ অক্ষয় রহুক, তাহা হইলেই শ্রাদ্ধের খরচের জন্য পুরোহিতের আর ভাব্না থাকিবে না।—

বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে চলিল ভৃত্য নব।

নবর বয়স এখন সাতা'শ। যখন প্রথম সে বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়ে তখন তার বয়স ছিল বাইশ। এই পাঁচ বৎসরেই সে. বিশ্বেশ্বরের সংসারের অপরিহার্য্য পুরাতন একটা অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নব যখন আসে নাই তখন তাঁদের কাজকর্ম্ম কেমন করিয়া নির্ব্বাহ হইত, এই কথাটা ভাবিয়া মাঝে মাঝে বিশ্বেশ্বরের সহর্ষ বিস্ময়ের অবধি থাকে না; এখন ত সে না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না!

পাঁচ বৎসর আগে ফাল্গুনমাসের একটা দিনে রুদ্দর-পুরের শ্রীধর মণ্ডলের বাড়ীর বাস্তুপূজা সারিয়া বিশ্বেশ্বর আ'ল ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাঠ পাড়ি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন; মাঠের শেষে গ্রামে উঠিবার পথের প্রান্তে কড়ুই গাছটার নীচে পৌছিয়াই তিনি বাধা পাইলেন; দেখিলেন, একটি লোক হাত-পা গুটাইয়া কাত হইয়া পড়িয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে। তার দরিদ্র বেশের দিকে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর ডাকিলেন,—কে তুমি এমন করে' পড়ে?

যে পড়িয়া ছিল সে কথা কহিল না।

বিশ্বেশ্বর ক্রমশঃ তেজ বাড়াইয়া আরও দু'বার প্রশ্ন করিলেন; এবং উত্তর না পাইয়া হাতের চটি মাটিতে নামাইয়া ছাতাটি মুড়িয়া ফেলিলেন, লোকটার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, মুড়ি ভাজা যায় এম্নি তা' গরম; ওষ্ঠাধর শুকাইয়া চড়্ চড়্ করিতেছে; নিঃশ্বাস যেন আগুন! বিশ্বেশ্বর আপন মনেই বলিলেন,—ম'র্বে না কি?

তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হাঁকডাক্ সুরু করিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের সাহায্যে পীড়িত ব্যক্তিকে গৃহের উঠান পর্য্যন্ত আনিয়াই দ্বিতীয়বার বাধা পাইলেন!—দেখিয়া লোকটাকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়, তবে হিন্দুর মধ্যেও নাকি এমন জাতিও আছে যে উল্লেখযোগ্য জাতির বারান্দায় উঠিবারও অযোগ্য। এখন হঠাৎ সেই প্রশ্নটিই উঠিয়া পড়িল। উঠানে নামাইলে এই ভরা-সন্ধ্যায় দেখিতে অতি বিশ্রী হয়; ক্ষেমঙ্করী তুমুল আপত্তি তুলিয়া তাহা করিতে দিলেন না; কাজেই বেহুঁস্ রোগীকে হাতের উপর করিয়া গ্রামের

প্রায় অর্দ্ধেক লোক, এমন কোলাহল জুড়িয়া দিল যেন বীরভদ্র বিশ্বেশ্বরের উঠানে পড়িয়া দ্বিতীয়বার দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিতেছেন। মানুষের বারান্দায় উঠিবার যোগ্যতা তার আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরটা কেবল সে-ই জানে যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। তর্ক ছাড়িয়া লাঠি মারিয়া বেড়াইলেও আর কাহারও নিকট হইতে উত্তরটা আসিতে পারে না, আশ্চর্য্য এই যে, এত-গুলি লোকের মধ্যে এই সরল কথাটি কাহারও মাথায় আসিল না।

একজন বলিল,—গোয়া'লে নিয়ে চল। গোয়া'লের জাত নাই।

বিশ্বেশ্বর চটিজোড়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি গোয়া'লের উল্লেখে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমার এতগুলো গরু যাবে কোন্ চুলোয়? ঘরবারান্দা আমার না তোমাদের হে? উঠাও বারান্দায়, তারপর যা' হয় তখন দেখা যাবে।—বলিয়া তিনি ভুল বশতঃ হাতের জুতা মাটিতে নামাইয়া পায়ে দিলেন।

লোকে বিস্মিত হইয়া গেল—বিশ্বেশ্বরের গোয়া'ল কি তার জাতের চাইতেও বড়!—

লোকটাকে বারান্দায় তোলা হইল; সে বিছানাও একটু পাইল, এবং শুশ্রূষায় ক্রমশঃ তার সংজ্ঞাও ফিরিল। তখন সে তার নাম বলিল, বিন্ধ্যপ্রসাদ, জাতিতে কুর্মী।

কুর্মী জাতটার সঙ্গে গ্রামের লোকের পরিচয় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—তোর হাতের জল খাওয়া যায়?

—যায়।—বলিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ আবার চোখ বুজিল। আঃ, বাঁচা গেল, জাতি রক্ষা হইয়াছে।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া কেবল চিরতার জল খাওয়াইয়া বিশ্বেশ্বর রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিন্ধ্যপ্রসাদ আত্মজীবনী যাহা বলিল তাহা এই—তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঘর ছিল গয়া জিলায়, কিন্তু সে-দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তার নাই, ছিলও না, দেশের জন্য লালায়িতও সে নয়; বাংলাদেশের মাটিতেই সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই মাটিরই ফলশস্য দানাপাণি খাইয়া সে এত বড় হইয়াছে; ভূভারতে আপ্নার জন কেহ তাহার নাই; মাঠ পার হইয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, নদী পার হইয়া আট ক্রোশ দূর সহরে সে কর্ম্মের অন্বেষণে যাইতেছিল, আরও কয়েকবার সে এ-অঞ্চল দিয়া যাতা-য়াত করিয়াছে;—এবার মাঠের মাঝামাঝি আসিতেই তার হি হি করিয়া কাঁপাইয়া জ্বর আসে; কোন প্রকারে বহুক্লেশে গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া সে গাছের নীচে জ্ঞান হারাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর মেহেরবান্ ঠাকুরজি গৃহে আনিয়া তাহার জান্ বাঁচাইয়াছেন। আর কোথাও যাইবার তার প্রবৃত্তি নাই, সে এই ঠাকুরজির কাছেই বিনাবেতনেই থাকিবে।—এই সঙ্কল্প নিবেদন করিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ বিশ্বেশ্বরকে বলিল, বাবাঠাকুর; ক্ষেমঙ্করীকে বলিল, মা। শুনিয়া ক্ষেমঙ্করীর মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হইয়া গেল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু তোর ঐ খোট্টাদেশের দাঁতভাঙা নাম ত' আমাদের মুখ দিয়ে বেরুবে না রে। আমরা তোর নাম রাখ্লাম, নব।

বিন্ধ্যপ্রসাদ হাত জুড়িয়া বলিল,—যে-আজ্ঞে, মা। আমি আপ্নার সন্তান; মা সন্তানকে যে নামে খুসী ডাকবেন।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—সেই ভাল। আমার সেই দশ মাসের ছেলেটা বেঁচে' থাকলে অতবড়ই হ'ত। তার নাম রেখেছিলাম, নব। বলিতে বলিতে ক্ষেমঙ্করীর চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদের চোখও যেন ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদ নামান্তরিত হইয়া নব ডাকেই সাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বাড়ীর সকলের কাছেই এই সুসংবাদটা ধরা পড়িয়া গেল, যে, নবর মুখই শুধু সাড়া দেয় না, তার অন্তরও যেন সাড়া দিয়া লাফাইয়া উঠে। মানুষের মনের এই বার্ত্তাটির মত সুসংবাদ বড় বেশী নাই; আমারই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্ম আর একটি অন্তর অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে শুধু এই অনুভূতি-টাই পরম অমৃতময়; মানুষের অদৃষ্টে এই অনুভূতির আস্বাদ বেশী মিলে না। ....দেখিতে দেখিতে ক্ষেমঙ্করীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত নবর এম্‌নি বশীভূত হইয়া উঠিল যে, অন্য কাজ করিবার ফুরসৎ পাওয়াই তাহার মুস্কিল হইয়া উঠিল।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—ও-রা আবার তোকেই বড়ভাই পেয়েছে।

—যে আজ্ঞে, মা।—বলিয়া নব যেন ধন্য হইয়া গেল।

সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট নবর মা ডাকটি। এমন সুর সে কোথায় পাইল কে জানে,—সময় সময় তাহার ডাকে ক্ষেমঙ্করী চম্‌কিয়া উঠেন; তাঁহার সকল হৃদয় মথিত হইয়া একটা অনির্ব্বচনীয় প্রীতির রস ফেনায়িত হইয়া উঠে। ..... নব খুব কম কথা বলে, হাসেও কম; মেঘের পশ্চাতে সূর্য্য লুকাইলেও তার আলো যেমন একেবারেই নিভিয়া যায় না, তেম্‌নি নবর কম কথা আর কম হাসির আড়ালে তার অন্তরের প্রসন্নতা কোনোদিনই অস্তমিত হইয়া যায় নাই।......দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন;—নবর গম্ভীর ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া যেমন সাহসে তাঁর বুক ফুলিয়া ওঠে, তার নিখুঁৎ পরিচ্ছন্ন কর্ম্মপটুতা দেখিয়া তেম্‌নি তাহাকে ভালবাসিতেও ইচ্ছা করে।

* * *

ক্ষেমঙ্করী অসুখে পড়িলেন।

নব মা বলিয়া ডাক্ দিয়া শতবার তাঁহাকে দেখিতে আসে; কোথায় তাঁর অশান্তি, চক্ষের নিমিষে সেটা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়া যায়।

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করেন,—ওদের সব খাইয়েছিস নব?

নব বলে—তুমি কিছু ভেব' না, মা। আমি খাইয়ে দাইয়ে ঠিক করে দিয়েছি। তোমার কাছে এলে তোমায় বিরক্ত ক'র্‌বে বলে' তাদের কাউকে আস্‌তে দেইনে।

—বেশ করিস্। কিন্তু মাঝে মাঝে আস্‌তে দিস্, বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে যে।

ছেলেমেয়েরা এখন বিশ্বেশ্বরের জ্ঞাতসারেই নবর হাতে খায়; বড় মেয়েটা রাঁধে; যতক্ষণ সে রাঁধে ততক্ষণ অন্যদিকে মন দিবার সময় বড় পায় না। তাই, দুই এক-দিন ইতস্ততঃ করিয়া নব ক্ষেমঙ্করীর অনুমতি লইয়া ছোটদের ভাতে হাত দিল। ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—তুই যে আমার ছেলে রে।—বিশ্বেশ্বর ভাবিলেন,—বিপদে নিয়মো নাস্তি।

ক্ষেমঙ্করীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর নিজে পত্নীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়েন, কিন্তু নব দিনের পর দিন সারারাত্রি অতন্দ্র নিষ্পলক চক্ষে ক্ষেমঙ্করীর মুখের দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া থাকে; সহস্রবার উঠিয়া তাঁর আরাম, ঔষধ পথ্য জোগায়।

কিন্তু ক্ষেমঙ্করী বাঁচিলেন না।

ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যু হইলে নব মা মা বলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল; ছেলেমানুষের মত শতবার সে বিশ্বেশ্বরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—বাবাঠাকুর, মা আমার কোথায় গেল? গ্রামের লোক বিশ্বেশ্বরকে শান্ত করিল, কিন্তু নবকে শান্ত করাই দুরূহ হইয়া উঠিল। ......তারপর নব শোকসম্বরণ করিয়া ছোটদের আগ্‌লাইয়া রহিল, শব শ্মশানে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুইদিন বাড়ীতে থাকিয়া বিধবা ভগনীর জিম্মায় ছেলে-মেয়েদের রাখিয়া বিশ্বেশ্বর অনুচর নবকে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

বিশ্বেশ্বরের তল্পীটি লইয়া নব তাঁহার পিছন্ পিছন্ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে লাগিল।—

বিশ্বেশ্বর বাড়ীতে নবর প্রভু ছিলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে নব তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিল বাড়ীর সেই চেহারার সঙ্গে তাহার কোথাও মিল নাই……

বিশ্বেশ্বর এখন ভিক্ষার্থী, অত্যন্ত করুণ তাঁর কণ্ঠ; এমনি তাঁর বিনীত নিস্তেজ ভাব যে যাহাকে স্বয়ং পদধূলি দিতেছেন, যেন তিনি তাহারও পদানত।

বিশ্বেশ্বরের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার অশিক্ষিত নিরক্ষর শিষ্যরা যে উদারতা দেখাইল তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।—শিক্ষিত যাঁরা, যাঁরা গুরুপুরোহিতের তোয়াক্কা না করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিকল্পে সিদ্ধ করাটাই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন, বিশ্বেশ্বরের টাকার থলিটা এখন দেখিলে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইয়া যাইত।

পূরা সাতশত টাকা বিশ্বেশ্বরের সংগ্রহ হইল,—এতগুলি টাকা থলিটায় তুলিলেন বিশ্বেশ্বর শুধু পদধূলি আর ধৃতোপবীত আশীর্ব্বাদ দিয়া। অর্দ্ধলক্ষ্মী কৃষিকর্ম্মে এবং বাংলার সেই লক্ষ্মী যে মাঠে আর বিলে তাহাতে আর যাহারই সন্দেহ থাক্ বিশ্বেশ্বরের নাই।

নব নিস্পৃহের মত চাহিয়া চাহিয়া এই টাকা আদায় করা দেখিল; দেখিয়া তাহার মনের গতি কোন্‌দিকে ফিরিল কে জানে; ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সে যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিতে লাগিল।—মানুষ পরমাত্মীয়কে পোড়াইয়া যেমন করিয়া শ্মশান হইতে ফেরে গতি তার তেম্‌নি মন্থর; স্বচ্ছ সন্তোষের যে স্ফূর্ত্তি তাহার চোখেমুখে হাল্কা হাওয়ার মত দিবারাত্র ঢেউ খেলিত তাহা যেন সহসা থমকিয়া গেছে………

বিশ্বেশ্বরের পা পড়িতে লাগিল খুব ফাঁক্ ফাঁক্, এতগুলি আমদানী সঙ্গের থলিতে বোঝাই—বিশ্বেশ্বরকে কিসে যেন ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল। লুঠ্-তরাজের ভয় একটা আছেই—সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, সঙ্গে এতগুলি টাকা; যে দিক্ দিয়াই হোক কেহ লাঠি কাঁধে করিয়া আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইলেই থলি সমেত টাকাগুলি তাহার হাতে বিনাবাক্যে তুলিয়া দিতে হইবে; এখনও প্রায় দুক্রোশ পথ চলিতে হইবে, তার দেড়ক্রোশই জনশূন্য প্রান্তর; সঙ্গে নব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একজন না আসিয়া যদি ঠাঙ্গাড়েরা পাঁচজন আসে তবে একা নবই বা তখন কি করিয়া রক্ষা করিবে!—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্যস্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর যথাসাধ্য তীরের মত চলিতে লাগিলেন; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, নব তল্পী লইয়া ঠিক সঙ্গেই আছে।

সূর্য্য যখন অস্ত গেল তখন বিশ্বেশ্বর মাঠের মাঝামাঝি আসিয়াছেন; এবার চৈতালীতে সোনা ফলিয়াছে—বিশ্বেশ্বরের বর্গাভাগে কিছু জমি ছিল।—ডা'ল্‌টা এবার সম্বৎসর কিনিতে হইবে না, ফসল ফলিয়াছে ভাল; ডা'লেরও কি কম খরচ; মানুষ শুধু খাইয়া খাইয়া ফতুর হইয়া গেল; খাওয়ার খরচ না করিতে হইলে টাকা জমিত কত!—ব্যাটারা আবার ফাঁকি দেয়; বিঘা ভুঁই দশ মণ ফলিলেও যা, দু'মণ ফলিলেও তাই; ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া এ পর্য্যন্ত কাহার কি সুসার হইল তাহাও ত' দেখা যায় না।—এবার দেখিয়া শুনিয়া ভাগটা আদায় করিয়া লইতে হইবে। খাতকরা কেবল খত্ বদ্‌লাইয়া দিয়া থামাইয়া রাখে, অথচ সুদ এক পয়সা দিবার নামটি নেই, যেন তামাদি রক্ষা হইলেই মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। এবার সুদ আর আসলেও কিছু না দিলে তিনি ছাড়িবেন না; তবে নালিশের বড় হাঙ্গাম, ঘরের টাকা গোড়াতেই—

হঠাৎ নব ডাকিল,—ঠাকুর!

চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া বিশ্বেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া পড়িলেন; ত্রস্তনেত্র ঘুরাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—যে-ভয় করিতেছিলেন সেই ভয়-ই আগত বুঝি; কিন্তু তা' ত' নয়। তাঁহারা দু'টি প্রাণী ভিন্ন প্রান্তর তেমনি জন-মানবহীন, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত নিঃশব্দ। এক ঝাঁক্ পাখী মাথার উপর দিয়া দিগ্বলয়ের দিকে ছুটিতেছে। অস্তগত সূর্য্যের আলোকাঙ্কনগুলি মিলাইয়া আকাশের প্রান্তে অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছে……

তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছিতে পারিলে বিশ্বেশ্বর বাঁচেন—বেটা অকারণে ডাকিয়া বাধা দেয় কেন? বিশ্বেশ্বর নিরুত্তরে চলিতে সুরু করিলেন।

নব আবার ডাকিল,—ঠাকুর!

চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন,—কেন রে?

নব বলিল,—পালাও।

সে কি! চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর আবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, তৃতীয় মানুষের নাম-গন্ধও নাই। বেটা ক্ষেপে গেল নাকি? দাঁড়াইয়া নবর কথাটার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহারই পশ্চাদ্দিক হইতে যে ব্যক্তি অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বিশ্বেশ্বর কাঁপিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সে নব। বিশ্বেশ্বরের না থামিয়া আর চলিল না, থামিয়া চোখ তুলিয়া দেখিলেন, নবর চোখের দৃষ্টি যেন কাঁপিতেছে, মুখে তাহার রক্তের লেশ মাত্রও নাই। বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কি রে? কি হ'য়েছে?

নব নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—বল্, কি হ'য়েছে। ভয় পেয়েছিস্?—বলিয়া বিশ্বেশ্বর গায়ত্রী স্মরণ করিলেন। এই মাঠেরই কোন্ দিকে যেন শ্মশান আছে, এবং এ-দিকে ভূতের ভয় আছে বলিয়াই জনশ্রুতি; সন্ধ্যার পর এদিকে সচল অগ্নিপিণ্ড অনেকেই দেখিয়াছে। তিনি এটাও এখন লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার তল্পীটা নবর হাতে নাই, তাহার নিজের লাঠিখানাও ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।—বিশ্বেশ্বরের গায়ে কাঁটা দিল। বলিলেন,—কি হয়েছে বল্না রে? দুর্গা, দুর্গা; ভালোয় ভালোয় মাঠটা পার হ'তে পারলে বাঁচি। কি, হ'ল কি তোর?

নব প্রত্যুত্তরে আগের কথাটাই আবার বলিল। সোজা তাঁহারই দিকে চাহিয়া বলিল,—পালাও।

—পালাব কেন?

—তবে পালিও না।—বলিয়াই নব বাঁ-হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল,—টাকা দাও, না দিলে—বলিয়া ডানহাত বাড়াইয়া যে জিনিষটা সে বিস্ময়ে-অবাক্ বিশ্বেশ্বরের নিষ্পলক চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ তুলিয়া ধরিল, সেটা সর্ব্বনাশীর একটিমাত্র দাঁতের মত ভয়ঙ্কর ধারালো, ঝক্ঝকে'। ছোরা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের শীর্ণদেহ আর খাড়া থাকিতে পারিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নবর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন; টাকার থলিটা তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—টাকা নে, কিন্তু প্রাণে মারিস্ নে, বাবা।

—সে হয় না।—এই কয়টি কথাই শুধু বিশ্বেশ্বরের কাণে গেল……

মুহূর্ত্তের জন্য একটা তীব্র ব্যথার অনুভূতি তাঁহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল।

তারপর তিনদিন পরে যখন তিনি বিছানায় শুইয়া চোখ মেলিলেন তখন তাঁহার সেই সাত শ' টাকার থলিটা আর নব সেখানে অনুপস্থিত।

নারী-বন্দনা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

স্বর্গেরি তুমি সুরবধূ—কিবা নরকের নন্দিনী!
দেবী ও দানবী—দু'য়েরি প্রতিমা, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মম!
কান্তি তোমার মহাবিষ, তবু সুধা-নিস্যন্দিনী—
রমণি, তুমি যে মদেরি পেয়ালা, রূপ যে মদিরাসম!

উষার আলোকে ভরি' ওঠে আঁখি, গোধূলিতে
ভরে' আসে,
অঙ্গ বিলায় মৃদু সৌরভ নিশার নিশাস পারা!
তব চুম্বন মোহন-মন্ত্রে শিশু জাগে উল্লাসে,
অধর-চষকে মধুপান করি' যুবজন চিত-হারা!

মরণেরে তুমি দু'পায়ে দলিছ নিঠুর ঘৃণার ভরে,
ভয় বেড়িয়াছে ও বাহু-লতায় বাজু হ'য়ে সুন্দরি!
পাপ যে বিরাজে মণি হ'য়ে ওই মনোহর বুক পরে,
—নাচে লালসায় পরশি' হরষে মন্মথ-মঞ্জরী।

মূঢ় পতঙ্গ তোমা পানে ধায়, সর্ব্বনাশিনী শিখা!—
দেহ দহে, তবু জয়গান করে তোমারি সে অবিরাম,
মরে যে প্রণয়ী চুমিয়া চুমিয়া চারু তব চরণিকা—
কণ্ঠে জড়ায় কাল-ফণী, আর জপ করে তারি নাম!

কিবা আসে যায়? হও ফণী—হও মঞ্জরী মঞ্জু বা!
রূপ যে অমৃত! তব ইঙ্গিতে, সৃষ্টির ভৈরবী!
অখিলের খিল খুলে যায়—হেরে রূপ-উন্মাদ যুবা
তোমারি ললাটে নয়নে অধরে অসীমার সেই ছবি!

তুমি গায়ত্রী!—ঋষি যেই হোক্—শয়তান, ভগবান!
পরাণহন্ত্রী মদিরেক্ষণা! তুমিই প্রাণেশ্বরী!
তোমারি গন্ধে, জ্যোতি ও ছন্দে, পরমায়ু মধুমান—
তুমি আছ, তাই গান গেয়ে কাটে সংসার-শর্ব্বরী।*

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
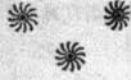
গ্রামের পশ্চিমে ছোট যে নদীটি আছে, বর্ষায় তাহার জলের রং হয়—লাল। পাহাড় হইতে গিরিমাটির ঢল নামে। নদীটির নাম—হিঙুল।

সেই হিঙুলের তীরে জমিদারের খানিকটা 'দো-জমি' বহুকালের অনাবাদী,— তাহাই চাহিয়া লইয়া শশী মোড়ল সে-বছর আলু ও পেঁয়াজের চাষ করিল।

ফসল সেখানে মন্দ ফলিত না, কিন্তু মাটি ফুঁড়িয়া আলু ও পেঁয়াজের সবুজ কলিগুলি মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতেই গাঁয়ের একপাল ছাগলে একবার খাইয়া গেল, আর-একবার কে যে খাইল তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানাই পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে ক্ষেত তদারক্ করিতে গিয়া শশী মোড়ল মাথায় হাত দিয়া বসিল। ছোট ছোট আলু-পেঁয়াজগুলি তখন সবেমাত্র মাটির রস টানিয়া বড় হইতেছিল,—তখনও তাহারা শিশু। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্ষেতের ভেলি খুঁড়িয়া সেই শিশু-শস্যগুলিকে গ্রামের কোন্ দুষ্ট ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে চুরি করিয়া লইয়া গেছে। ফসল বলিতে মাঠে আর একটিও নাই। পরন্তু সে জমি-'সেয়াং' করিয়াছে। ক্ষেতের মাটি তখনও ভিজা। সেই ভিজা মাটির উপর ছেঁড়া আলুর লতা ও কচি পেঁয়াজের সবুজ কলিগুলি যেখানে-সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে,—এবং তাহারই উপর মানুষের পায়ের দাগ তখনও পর্য্যন্ত স্পষ্ট জল্-জল্ করিতেছিল।

শশীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। হইবারই কথা।

চাষার ছেলে,—নিজের জমিজমা এক কাঠাও নাই। ভাল জমিদার। চাহিতেই তিনি এটুকু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই হাল-গরু লইয়া পাঁচবার সে এই মাটিতে চাষ দিয়াছে, সার ফেলিয়াছে। তাহার পর এতদিনের অনাবাদী ওই অতখানি পতিত জমি,—লোহার কোদাল দিয়া একহাঁটু পরিমাণ নীচের মাটি উপরে উঠাইয়া জমি পাট করিতে হইয়াছে। তাহার উপর ভেলি কাটিয়া বীজ পুঁতিয়াছে।

এতদিনের এই এতখানি শ্রমসাধ্য ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার পরেও শশী নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি তাহার কাটাইতে পারে নাই।

হেমন্তের পরিচ্ছন্ন আকাশেও কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগতই মেঘ উঠিতেছিল। সঞ্চরমান খণ্ড মেঘের

---

* Baudelaire-এর অনুসরণে।

সমারোহে সেদিন চাঁদের আলো হঠাৎ ঘোলাটে হইয়া গেল। শশীর আশঙ্কার আর অবধি রহিল না।

—"আর দু'দিন, আর তিনদিন পরে ভগবান্!"

মাটির নীচে বীজগুলি হয়ত তাহার পচিয়া যাইবে।

মেঘ কাটিয়া গেল।

শশীর এক-একটি দিন কাটে,—মনে হয়, যেন এক-এক বৎসর। রোজ ক্ষেতে যায়; রোজ সে ভেলির মাটি ধীরে-ধীরে সরাইয়া দেখে—।

দেখিতে দেখিতে সেদিন প্রভাতে হঠাৎ তাহার সমস্ত জমিটি সবুজ হইয়া উঠিল। আনন্দে শশীর মুখে সেদিন আর ভাত রুচিল না।

ছাগলে যেদিন পেঁয়াজের কলিগুলি খাইয়াছিল, শশী বলিয়াছিল, "থাক্—আবার হবে।"

কিন্তু আজ আর সান্ত্বনার কোনও পথই তাহার জন্য উন্মুক্ত রহিল না। শশীর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বাহিরের বসিবার ঘরে জমিদার একাকী বসিয়া ছিলেন।

শশী ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সীতাপতি আচার্য্য মুখ তুলিয়া চাহিতেই হাতজোড় করিয়া শশী বলিল, "হুজুর—!"—বলিয়াই সে সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল,—

"চোরে সব চুরি করে' নিয়ে গেছে হুজুর, আলু পেঁয়াজ, যা-কিছু বসিয়েছিলাম—সব।"

"সব?"

শশীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, —নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে যা।"

"ঘুমোইনি হুজুর,—চোরে নিয়ে গেল, এই—সবে ছোট গাছ, এখনও—"।

কথাটা শুনিবামাত্র তিনি রুখিয়া উঠিলেন।

"ঘুমোস্‌নি হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো? না ঘুমোলে চোরের বাবার সাধ্যি কি নিয়ে যায়! বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, বেরো আমার সুমুখ থেকে।"

শশী তাঁহাকে চিনিত, কাজেই সে উঠিয়াও গেল না, জবাবও দিল না, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু জানালার বাহিরে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সুমুখে একটা পানাভর্ত্তি ছোট পুকুরের কিনারে সাদারঙের তিনটি বক লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ একটির শিকার মিলিয়া গেল। মাছটা সে দুই ঠোঁটের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উড়িয়া যাইতেই, অন্য দুইটা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া অধিকতর সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিল।

তাঁহাকে এমনি নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শশী বলিল, "গাছ খুব পুষ্টলো হয়েছিল হুজুর—"

জমিদার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হবে না? নদীর উপরে দো-জমি, ওর দাম কত জানিস? আস্‌ছে-বছর থেকে আমি নিজে চাষ করব সেখানে, তোরা পারবিনে, তোরা নেহাৎ আহাম্মুক্।"

শশী বলিল, "কিন্তু গাঁয়ের সব দুষ্ট লোকের দায়ে কিছু পাবেন না হুজুর।"

সীতাপতিবাবু আবার চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "পাব না কি রকম? তুই পেলিনে বলে' আমিও পাব না?—জেনে-শুনে তবে কেন গিয়েছিলি আমার জমিতে হাত দিতে? আমার হাল-গরু-মুনিষের দাম লাগে না বুঝি? আমার জমির বুঝি খাজনা নেই?—টাকা ফেল্ —ফেলে উঠে যা বলছি বজ্জাত চাষা কোথাকার!"

রাগে একপ্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে পুনরায় তিনি সেই জানালার পানে ফিরিয়া তাকাইলেন।

বক দুইটা তখন উড়িয়া গেছে; ভাঙা একটা পোড়ো বাড়ীর দেওয়ালের উপর প্রকাণ্ড একটা শকুনি বসিয়াছিল। নিমতলার 'ভাগাড়ে' হয়ত' গন্ধ পড়িয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ আবার এমনি নীরবে থাকিয়া মনে

হইল যেন সীতাপতিবাবুর রাগটা খানিক্ কমিয়া আসিয়াছে।

জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দাদার কানে যদি একবার ওঠে যে, জমি তোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি বিনা-খাজনায়, হাল দিয়েছি, গরু দিয়েছি, মুনিষ দিয়েছি, সার দিয়েছি, অথচ একটি পয়সার দাবী দাওয়া রাখিনি,—তাহ'লে আমার দশাটা কি হয় একবার ……না, না, সেকথা তোরা ভাব্‌বি কেন শশী? চুপটি করে' ঘরে গিয়ে ঘুমোগে তার চেয়ে,—কাজে লাগ্‌বে। মাগ্-ছেলে নিয়ে উপোষ ত' দিতেই হয়—এবছরটাও দে।"

অশ্রুভারে শশীর কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অতিকষ্টে ঢোঁক্ গিলিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "পাঁচটি টাকার বীজ এনেছিলাম হুজুর—"

কিন্তু সে-কথার জবাব না দিয়া সীতাপতিবাবু ক'হিলেন, "ক্ষি না হয় করে দিলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কি জন্যে মরতে ইস্কুলে দিয়েছিস্? বিষণ দের ছেলেটাকে দেখেছিস্? দু'পাতা পড়তে শিখে' ভাবলে বুঝি-বা লাট্-বেলাটই হয়ে যায়! ও লাঙ্গল ধরবে বলে ত' আমার মনেই হয় না। এম্‌নি ধিক্‌পিকে' প্যাকাটির মত চেহারা,—ধরবেই বা কার জোরে?"

ধরা-ধরা গলায় শশী বলিল, "না আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে বলাইকে আমি লাঙলও ধরাব, মাটিও কাটাব।"

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটা-সোটা হোক্, বুকখানা চওড়া হোক্,—মানুষ হোক্! মানুষ হোক্!"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার পকেটে হাত দিয়া কি যেন বাহির করিলেন, এবং তাহাই তিনি শশীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "মিছেমিছি আমার কপালে এই দণ্ডটি ছিল।"

পাঁচ টাকার একটি নোট দেখিয়া শশী প্রথমে থতমত খাইয়া গেল। কি যে বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বলিল, "টাকা আমি···আজ্ঞে হুজুর···টাকা···আপনার শ্রীচরণে···আমি···"

"চাইনি। কেমন?—বেশ, দরকার না হয় ফিরে দিয়ে যাও। তবে আর মুখ্যু চাষা বলেছে কাকে? কাল্‌কেই আবার সেই আমার দুয়োর ভিন্ন গতি নেই বাবা!—বীজের দরুণ পাঁচ-সাতটি টাকা আমার লোকসান হলো হুজুর, মেয়ে উপোস, ছেলে উপোস, বৌ কাঁদছে—"

বলিয়াই তিনি একবার দরজার দিকে তাকাইলেন।

সুমুখের ছোট বাগানটির এককোণে, কাগ্‌জি-লেবুর একটা গাছে সে-বছর বিস্তর লেবু ধরিয়াছিল। কিন্তু মজা এই যে—সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই যে না আলস্য করে, সে-ই দুটা ছিঁড়িয়া লইয়া ঘরে চলিয়া যায়।

পণ্ডিত-গিন্নির পাশেই ঘর,—সুবিধা তাহারই সব চেয়ে বেশি। দিন নাই, রাত নাই, লেবু খাওঁয়াটা তাহার ঘরে খুব জোর চলিতেছিল। সে-দিন সে হাতে হাতে ধরা পড়িবামাত্র হ্যা হ্যা করিতে লাগিল। অসংবদ্ধ অর্থহীন ভাষায় নিজের দোষ ঢাকিবার চেষ্টাও সে কম করে নাই। বলিল, "ছোট ছেলেটার অসুখ বাবা··· তোমারই খাই, তোমারই পরি, এ আর বেশি কথা কি, —ইষ্টিশানের খোঁড়া ডাক্তারকে দেখালাম, গাছের ফল, তাই বলি দুটো···এ আর—"

সীতাপতিবাবু সেদিন তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। বলিবার আছেই-বা কি!

আজ আবার সেই পণ্ডিত-গিন্নিকেই বাগানের দরজায় ঢুকিতে দেখিয়া শশীর সহিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "চুরি করে' নেওয়া কেন বাপু, দু'চারটে দরকার, চেয়ে নিলেই ত' হয়!"

কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাটা বলা হইল সে তখনও দূরে। কাজেই জবাব দিল শশী।

হাত জোড় করিয়া বলিল, "চুরি? আজ্ঞে আমি ত জীবনে···কস্মিন্‌কালেও···"

"তোকে বলিনি !"

শশী পিছন ফিরিয়া দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু পণ্ডিত গৃহিণী তখন চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সীতাপতিবাবু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

পণ্ডিত-গিন্নির মিশি-ছোপানো কালো রঙের দুই পাটি বড় বড় দাঁত সর্ব্বপ্রথমে বাহির হইয়া পড়িল; তাহার পর সে তাহার দড়ির মত পাকানো হাত দুইটি নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি আমাদের কোলে-পিঠে মানুষ-করা ছেলে সীতেনাথ, অধম্ম তোমাকে আমি করতে দেব না কখনও।"

তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য পণ্ডিত-গৃহিণীর দরদী অন্তঃকরণে সহসা আজ এত বেশি মমতাবোধ কেন যে এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল—সীতাপতিবাবু সেকথা বুঝিলেন, কিন্তু বুঝিয়াও তাহাঁকে সব কথা বলিবার অবসর দিয়া নিজে চুপ করিয়া রহিলেন।

পণ্ডিত-গিন্নি বলিল, "আমাদের গুষ্টি হলো পণ্ডিতের গুষ্টি। দুগ্যো-বাংলার পাঠশাল্ আমাদের হক্কের জিনিষ; —চোদ্দ পুরুষ ধরে' ওই পাঠশাল্ আমাদের। দেবেন ছাড়া ওখানে আর-কেউ ছেলে পড়াতে পাবে না, তা আমি বলে' রাখ্ছি বাবা !"

এই বলিয়া জবাবের জন্য একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "কেন, ছেলেবেলায় পড়নি আমাদের দেবেনের বাপের কাছে ? লেখাপড়া তোমরা শিখ্লে কোথা ? সেই তারই দৌলোতে। সে আজ বেঁচে থাক্লে—"

বলিতে বলিতে পণ্ডিত-গিন্নি চট্ করিয়া এক থামচা কাঁদিয়া লইয়া চোখের জল মুছিয়া নাক ঝাড়িয়া আবার তেম্নি দিব্য সহজ গলায় কহিল, "আমার শ্বশুরের কাছে পড়েছে তোমার দাদা। আর আমার শ্বশুরের বাপের কথা না হয় ছেড়েই দাও, তিনি ছিলেন ল্যায়নঙ্কা, তেমন পণ্ডিত ক'জন মেলে ? এক-এক কাজ-কম্মে যেতেন আর এম্নি বড় বড় পিতলের ঘড়া-কলসি, চাদর-গামছা ভিন্ন ঘর ঢুক্তেন না,—আর সে-সব কাপড় কি,—সে-সব ঘড়া কি ! তার হাতের লেখা তালপাতার পুঁথি এখনও গাদাবন্দি গোঁজা রয়েছে আমার রান্নাঘরের চালে। তার একটি আখর্ উঠোয় এখন কার বাবার সাধ্যি !"

আর ভাল লাগিতেছিল না, সীতাপতিবাবু বলিলেন, "তোমার দেবেন ছেলে-পড়াবার কিচ্ছু জানে না, তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে রাশু ভট্চাজ্‌কে পাঠশালাটি দিয়েছে,—বুঝলে ?"

রাশু ভট্চাজের নাম শুনিয়া পণ্ডিত-গিন্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, "আমার শ্বশুরের গদ্দিতে শেষকালে বস্লো কিনা ওই রেশো ? ছেলে পড়াতে আমার দেবেন জানে না—জানে তোমার ওই রেশো ভট্চাজ্ ? ও মা আমার কে রে ! কই, বলুক দেখি আরও দশজনা,—গাঁয়ের ছেলেরা কাকে ভয় করে ? রেশোকে, না আমার দেবেনকে ? দেবেনকে দেখ্লে ছেলেরা সব কাপড়ে মোতে, তা জানো ?……ওই আমার উঠোনের কুল গাছটি ত দেখেছ ?—পাকা কুল সেই চোত্-বোশেখ্ পর্য্যন্ত থাকবে। কেন, কই, পাড়ার ছেলের দৌরাত্যিতে আর কারও গাছে থাকে ? দেবেনের ভয়ে ছেলেরা আমার দুয়োর মাড়ায় না।……আর—আমাদের যুগ্‌লী, দেবেনের চেয়ে বড়ই ত ? দিদি হয়। কিন্তু কই, আমার দেবেনের সাক্ষাতে রা'টি করুক্ দেখি ঘরে ? তরকারি কই এতটুকু কম দিক্ দেখি পাতে ?"

পণ্ডিত-গিন্নি সহজে হটিবার পাত্রী নয়। কি বলিয়া যে তাহাকে বুঝাইয়া বিদায় করিবেন সীতাপতিবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ভাবিতে হইল না।

সুমুখে রাস্তার উপর অনেকক্ষণ হইতেই সমবেত কয়েকজন মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত জনস্রোত তাঁহার সেই ছোট বাগানের পথ ধরিয়া হুড়মুড়্ করিয়া একেবারে তাঁহার দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যে-দৃশ্যটি সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহাতে এই নিরীহ নির্ব্বিরোধ মানুষটির একটুখানি চমকিয়া উঠিবারই কথা।

বিক্ষুব্ধ সেই জনসঙ্ঘের সর্ব্বাগ্রে রাখহরি পাঠকের দুইহাতে দুইজন ধরিয়া ধরিয়া হাঁটাইয়া আনিতেছিল, মাথাটা তাহার ফাটিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ। মাথার ক্ষতস্থান হইতে তখনও পর্য্যন্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁচা রক্ত ঝরিতেছিল। মুখের উপর রক্তের দাগ কালো রং ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া গেছে।

হরেকিষ্ট তাঁতিরও সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত,—কয়েক জায়গায় কয়েকটা আঁচড়ের চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান।

কাহারও সহিত মারা-মারি হাঙ্গামা যে একটা-কিছু হইয়াছেই এবং কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পাড়েপাড়ার যে গোল-মাল তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন তাহাও যে ইহাদের লইয়াই, সে কথা বুঝিতে সীতাপতিবাবুর অধিক বিলম্ব হইল না।

রাখহরি তাহার ফাটা মাথা লইয়াই তাঁহার পায়ের কাছে সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

—"রক্ষা করুন হুজুর! আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনি রাজা,—আপনি রক্ষা করুন!"

হরেকৃষ্টও সেইসঙ্গে তাঁহার পা-দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ,—আপনিই……"

কিন্তু কি হইয়াছে, কেন যে তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন এবং এই রক্তারক্তি মারামারির হেতুটাই বা কি, তাহার সঠিক সংবাদটি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার প্রশ্ন করিবার পর, হরেকৃষ্ট তাঁহার পা দুইটি ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং এই সর্ব্বনাশের হেতুটি যে কি, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার নিমিত্ত বারকতক্ ঢোঁক্ গিলিয়া নিজেকে প্রথমে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "শুনুন্ তবে আজ্ঞে! নিবেদন পাই।"

এই বলিয়া তাহার ভণিতা সুরু হইল।

তাহার পর, সে যে কেমন করিয়া গণেশ পাঁড়ের মাথাটা চেলাইয়া ছু-ফাঁক্ করিয়া দিতে পারে, এবং কিশোরী পাঁড়ের স্থূল উদরের পুরু চামড়াটি কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে নাড়িভুঁড়িগুলি যে কি-প্রকারে মাত্র মিনিট-কয়েকের মধ্যেই টানিয়া বাহির করিতে হয়,—রাগের মাথায় তাহারই ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে সে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল।

অসহিষ্ণু হইয়া সীতাপতিবাবু তাহাকে জোরে এক ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চোপ্ হারামজাদা পাজি ছুঁচো, চোপ্! ও-সব শুন্‌তে চাইনে তোর কাছে,— কি হয়েছে তাই বল্, নইলে—উঠে' যা এখান থেকে— ভাগ্!"

চোখের উপরের খানিকটা রক্ত হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া রাখহরি এইবার উঠিয়া বসিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আমি বলি। তুই চুপ্ কর্ হরেকিষ্ট!"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রাখহরি যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, গত কয়েকদিন হইতে উপর্য্যুপরি তাহার মাঠের পাকা ধান চুরি যাইতেছিল। যাই যাই করিয়া মাঠের দিকে একদিনও তাহার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু আজ সে হঠাৎ মাঠে গিয়া দেখে যে, গণেশ পাঁড়ের বড় ছেলে চৈতন, নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহারই মাঠের উপর গরু চরাইতেছে এবং কতকগুলা পাকা ধান কাস্তে দিয়া কাটিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ক্ষেতের একপাশে আঁটি বাঁধিয়া গাদা করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই সহিত প্রথমে দু'এক কথা বলা-কওয়া হয়। কিন্তু চৈতন কিছুতেই শোনে না—গরু সে চরাইতেই থাকে। নিরুপায় হইয়া রাখহরি তখন জন-দুই-তিন লোককে সাক্ষী রাখিয়া নালিশ করিবার জন্য আদালতে যাইতেছিল। পাঁড়ে-পাড়ার রাস্তায় গণেশের সঙ্গে দেখা। চৈতন ইতিমধ্যে ঘরে ফিরিয়া তাহার বাবাকে সংবাদ দিয়াছে। গণেশ পাঁড়ে চোখ লাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্?" রাখহরিও রুখিয়া

জবাব দেয়, "আদালতে। তোমার নামে নালিশ কর্‌তে।" কথাটা শুনিবামাত্র লাঠি হাতে লইয়া সে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। রাখহরি বলিল, "কি রকম ?"

"এই রকম।"—বলিয়া গণেশ পাঁড়ে তাহার হাতের লোহা-বাঁধানো লাঠি দিয়া প্রথমেই এক লাঠি এইখানে মারে।

হাত দিয়া রাখহরি তাহার রক্তাক্ত মাথার ডান-দিকটা দেখাইয়া দিল।

"তারপর এইখানে।"—বলিয়া রাখহরি তাহার অঙ্গের আর-একটা স্থান দেখাইতে যাইতেছিল, হরেকিষ্ট বলিল, "আর কিশোরী ? চৈতন ? ওদের নাম করলে না যে ঠাকুর ?"

ঘাড় নাড়িয়া রাখহরি বলিল, "হাঁ, ওরাও।"

হরেকিষ্ট তখনও হাতজোড় করিয়াই ছিল। বলিল, "আবার বলে কি-না থানা-আদালতের নাম করেছিস কি খুন করেছি। চৈতন, তুই ঘাঁটি আগ্‌লে বসে' থাক্, এইদিকে শালারা পেরোবে কি আমায় খবর দিস্।"

সীতাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকেও মেরেছে নাকি ? তুই কোথায় ছিলি ?"

তৎক্ষণাৎ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত হরেকিষ্ট কহিল, "আজ্ঞে আমি ত সঙ্গেই। আমিই ত সাক্ষী।—আমাকে যৎপরনাস্তি,—এইখানে, এইখানে, এইখানে আর এইখানে।"—বলিয়া সে তাহার ধূলি-ধূসরিত অঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই মারের দাগ দেখাইয়া দিল।

সীতাপতিবাবু একবার সম্মুখের পানে তাকাইলেন। গ্রামের বিস্তর লোক সেই ছোট বাগানখানির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাছপালাগুলি বুঝি আজ আর থাকে না!

হরেকিষ্ট বলিল, "উল্টো বলে কিনা ডিমওয়ালার কাছ থেকে আমরা টাকা কেড়ে নিয়েছি—"

কিন্তু সীতাপতিবাবু সেকথা শুনিতে পাইলেন না। সম্মুখে জনতার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তোরা কি জন্যে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছিস্ বাপু ?—যা বাড়ী যা। বাড়ী যা সব,—এখানে কি আছে তোদের ?"

কেনারাম মুখুজ্যে পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। জমিদারের কাছে ডিমওয়ালার কথাটা পট্ করিয়া বেফাঁস্ বলিয়া ফেলা হরেকিষ্টর উচিত হয় নাই। কাজেই ইঙ্গিতে-ইসারায় সেকথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য হরে-কিষ্টর মুখের পানে তাকাইয়া কেনারাম বারকতক্ তাহাকে চোখ টিপিল। কিন্তু চোখের পাতাদুইটা যাহার দিনরাত উঠা-নামা করে, তাহার চোখ টেপা না-টেপা দুই-ই সমান।

হরেকিষ্ট আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

কেনারাম তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ছেড়ে' দাও—ছেড়ে' দাও, ও-কথা ছেড়ে দাও। দোআনি দুটি ত' এখনও আমার কোঁচড়ে-কোঁচড়েই ফিরুছে, কি যে করব, কাকে যে দেব, তা ত' ভেবেই পাই না ছাই!"

সীতাপতিবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কিসের দু'আনি ? কার ? কাকে দিতে হবে ?"

কথাটাকে তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিয়া কেনারাম বলিল, "ও-ই এক-বেটা ইষ্টিশানের মেড়ুয়া দিয়ে গিয়েছিল ধম্মরাজের পেনামী—পুজোর জন্যে যৎসামান্য কিছু—। আর, তো-বেটার আচ্ছা আক্কেল যাহোক্, বেটা তাঁতি কিনা! বল্‌লেই হলো অম্‌নি লোকের নামে দোষ দিয়ে যা-তা! গণ্‌শা না-হয় বজ্জাতই ধরে' নিলাম,—তাই বলে' কি·····আরে এই! তোরা কি দিবি আজ বাগান-টাকে ভেঙে ? না, কী মনে করেছিস কি ? এ কি ভালুক-নাচ, না বাঁদর-নাচ, যে, সবাই মিলে দেখ্‌তে এসেছিস্ ছুটে' ?"

এই বলিয়া খানিকটা চেঁচাইয়া সীতাপতিবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া চুপি-চুপি কহিল, "তাহ'লে এখন কি করা যায় বল দেখি ভায়া ? মেয়েছেলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করা—এ যে একটা—"

কথাটা তাহার আর শেষ হইল না। এতবড় গুরুতর সমস্যার চিন্তায় মুখখানি তাহার দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত ম্লান্ হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতাদুইটিও খুব ঘন-ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "করবে আবার কি? ঘরে ঘরে মিটিয়ে নিতে পার নাও, নইলে্ নালিশ করে' এসো।"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়াই বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, নালিশ আমরা ও-বেটার নামে একনম্বর ঠুক্‌বই।"

সীতাপতিবাবু পুনরায় ভিতরে গিয়া বসিতেছিলেন, কেনারাম বলিল, "নালিশ ত' করবে, কিন্তু যায় কেমন করে?—পেরোবে কেমন করে? ওরা যে ওৎ পেতে বসে' আছে।"

কেনারামের কথাটা শুনিয়া তিনি রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি কি নিজে গিয়ে পার করে' দিয়ে আসব না কী মতলব তোমাদের?"

কেনারাম খানিকটা জিব বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "রাম বল। তাই কি আর বলতে পারে কেউ? তবে কিনা এই একটা চাপ্‌রাশী-টাপ্‌রাশী, দু'একজন লোক………"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা মারামারি ফুটোফুটি কর, আর আমি লোক জুগিয়ে মরি! নিয়ে—দিক্ বেটা আমাকেও এই সঙ্গে গেঁথে! বলিহারি বুদ্ধি যাহোক্ তোমাদের! না—না, ও-সব হবে-টবে না, ও-সব হবে না আমার কাছে। তোমরা যা-খুশী তাই কর,—মারামারি হাঙ্গামাতে আমি নেই।"

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সেই জানালার পানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা যদি একবার শোনে একথা, তা'হলে অপমানের আর বাকি থাকবে না কিছু।—ভয়েই যদি মরতে হবে জানিস্, ত' কী দরকার ছিল তোদের মারামারি করতে যাবার—বল্ দেখি বাপু? ও বেটা চোয়াড়; ও বেটা ছোটলোক, ও সব পারে, ও খুন করতে পারে!"

বেগতিক দেখিয়া রক্তাক্ত কলেবরে রাখহরি নিজেই তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "পড়ে' পড়ে' মার খেতে হয় তাহ'লে হুজুর, নালিশ-মোকর্দ্দমা আর হয় না।"

অনেকক্ষণ হইতেই সীতাপতিবাবু রাখহরির মুখের পানে তাকাইতে পারিতেছিলেন না, এইবার মুখ তুলিয়া তাহার সেই রক্তরঞ্জিত শুষ্ক মুখখানার দিকে তাকাইতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

"আঃ! জ্বালালি দেখ্‌ছি তোরা আমায়! যা তবে তাই, যা আমার ছেলের কাছে, সে-ই সব ঠিক করে' দেবে, বল্‌বি তোমার বাবা বল্‌লে, যা।—ওরে কে রয়েছিস্? নবীন কোথায়, নবীন কোথায় জানিস্ কেউ?"—বলিয়া একবার তিনি বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

কৌতূহলী দর্শকের মধ্যে কতকগুলা ছেলে তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। কে একজন বলিয়া উঠিল, "নবীন-দা ইস্কুলে।"

ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া দিলেন, "বল্‌গে যা—তোমার বাবা বল্‌লে, দু-জন চাপরাসী আর একজন চৌকিদার বেশ জোয়ান্ দেখে'—বেশ করে' বলে দেয় যেন তাদের,—ফের্ যদি রাখুর গায়ে কেউ হাত তুল্‌তে আসে ত'……আচ্ছা যা, নবীনকে সে-সব কিছু বল্‌তে হবে না, বলে' সে দেবেই।"

স্কুলঘর বেশী দূরে নয়। দূরের সে পুরাতন ইস্কুলটি এখন নূতন ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। যিনি ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন দরিদ্র, এবং বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার মৃত্যুর পর ইস্কুলটিরও মরিবার জো হইয়াছিল,—সম্প্রতি তাহাই আবার বাঁচিয়া উঠিয়া নবজীবনের প্রবল ধাক্কায় ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

জমিদারের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পাশে পরিত্যক্ত একটি ভিটের উপর গন্ধ-গোকুল ও ফণীমনসার জঙ্গল কাটিয়া নবীনের উৎসাহে কয়েকটি চুনকাম্‌করা খড়োঘর তৈরী হইয়াছে; স্বর্গগত প্রতিষ্ঠাতার বড় ছেলেটি পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে শহরের আপিসে কেরাণীর কাজ ছাড়িয়া হেডমাষ্টারীতে বহাল হইয়াছেন; আর-একটি ছেলে তাঁহার দূরের এক কয়লা-কুঠিতে হারমোনিয়াম ও বাঁশী সারানোর দোকান খুলিয়াছিল, শিক্ষকতা করিবার জন্য সেও গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামেরই এমনি আরও কয়েকজন ছোকরা লইয়া স্কুলটি এখন কোন-রকমে টিম্‌টাম্ করিয়া চলে।

সেকেণ্ড-পণ্ডিত ভট্‌চাজ্‌-মানুষ, ভিন্ন-গ্রামের কয়েক-জন পয়সাওয়ালা চাষা তাঁহার যজমান। তিনি স্পষ্টই বলেন—

"আট-আনার পণ্ডিতী করতে গিয়ে দুটাকার যজ্‌মান ত' আমি ছাড়তে পারি না নবীন!" এবং কি-একটা শ্লোক আওড়াইয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে তিনি ইহাও বলেন যে, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী থাকিতে বলদ দোহন করিবার পেশা তাঁহার নয়।

ইহার উপরে আর কথা চলে না। নবীনই গিয়া তাঁহার ফাঁকা-ক্লাসের ভাঙা চেয়ারখানি দখল করিয়া বসে; ছেলেদের গল্প শুনায়।

ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও ছেলেরা উঠিতে চায় না, বলে, "তারপর—সার্—তারপর?—"

নবীন ধমক দিয়া বলে, "তারপর জ্যামিতি।"

ছোট ছেলে,—গল্প শুনিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারে না, নিতান্ত অনুনয়ের সুরে দু'একজন বলিয়া উঠে, "না সার্, জ্যামিতি নয়,—আপনি।"

হাসিতে হাসিতে নবীন পুনরায় গল্প করিতে বসে।

হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় বাহিরে চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া তামাক টানিতে টানিতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন। ছেলেরাও অঙ্ক-জ্যামিতির হাত হইতে সেদিনের মত বাঁচিয়া যায়।

সেকেণ্ড-পণ্ডিতের যজ্‌মান-ঘরে জাঁকালো-রকমের একটা অন্নপ্রাশন ছিল। ছেলেরা তন্ময় হইয়া মহাভারতের গল্প শুনিতেছে। এমন সময় সীতাপতিবাবুর পাঠানো সেই ছেলেটা নবীনের কাছে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার সংবাদটি বহন করিয়া আনিল, এবং সকলেই যে তাহার অপেক্ষায় অদূরে রাস্তার উপর শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে সে-কথাও তাহাকে জানাইয়া দিল।

পাঁড়ে-পাড়ার গোলমাল সে শুনিয়াছিল, কিন্তু এমন যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে তাহা সে ভাবে নাই। তৎক্ষণাৎ সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেরা গোলমাল করিতেছিল, খুব জোরে একটা ধমক দিয়া নবীন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিবামাত্র রাখহরি হাউমাউ করিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল,—

"—এই হলো ভায়া, তোমার জমিদারীতে বসে' শেষপর্য্যন্ত মারই খেয়ে এলাম।"

কেনারাম বলিল, "যাহোক্ এর একটা-কিছু কর বাপ্।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা হরেকিষ্ট সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

দুইজন চাপরাশী ডাকাইয়া নবীন বলিল, "যাও, তোমরা এক্ষুনি নালিশ করে' এসো।"

চাপরাশীদের বলিয়া দিল, "মহতাপ্, ফের্ যদি ওরা মারামারি করতে আসে, আমার হুকুম নেই বলে ফিরে এসো না যেন।"

"যো হুকুম মহারাজ!"—বলিয়া চাপ্‌রাশী দুজনেই সেলাম করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

"শুধু সেলাম ঠুক্‌লে চলবে না মহতাপ্, গাঁয়ের ভেতর এসব বড় সুবিধের ব্যাপার নয়।"

পথের ধারে জমিদারী-কোটাল হাত-জোড় করিয়া বসিয়াছিল, নবীন বলিল, "তোমার চাকুরী আর থাকে না কোটাল!"

কোটাল বলিল, "হুজুর—"

"হুজুর নয়। দিনে-দুপুরে লোকের ধান চুরি যাবে, পাকা ধান গরুকে খাইয়ে দেবে,—এসব চলবে না, চলতে পারে না।"

"পাঁড়েদের সঙ্গে হুজুর—"

নবীন বলিল, "সেই জন্যেই ত বলি—চাকরীতে জবাব দাও।"

এমন সময় কপিল চক্কোত্তি চাকু ছুরি দিয়া বাঁশের একটা কঞ্চি কাটিতে কাটিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুপুর বেলাটা প্রায়ই তাহাকে এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়। থার্ড-পণ্ডিত ছেলে ঠেঙাইতে ওস্তাদ, ছেলেদের পিঠে এমন নির্ম্মমভাবে ছড়ি ভাঙিতে আর কেহ পারে না। রোজ তাহার দু'তিনটি নূতন ছড়ির প্রয়োজন হয়। এবং সে ছড়ি জোগায়—কপিল। ছেলেরা মার খায়, কাঁদে; কপিল তাহাই দেখিবার জন্য একটি বেঞ্চের একপাশে গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে,—দেখে, আর হাসে। এমন-কি নিত্য নূতন ছড়ি কাটিয়া দিবার জন্যই কিছু চাল বিক্রি করিয়া ষ্টেশনের কোন্ এক মনোহারীর দোকান হইতে কপিল সেদিন ওই ঝক্‌ঝকে ধারালো ছুরিখানি কিনিয়া আনিয়াছে।

কেনারামকে দেখিবামাত্র ছুরি বন্ধ করিয়া কপিল তাহার হাতের কঞ্চিখানা নাচাইতে লাগিল।

"—পড়া হয়নি কেন শূয়ার, পড়া করিস্‌নি কেন? নে—হাত পাত! হাত পাত! পেতেছিস্?"

বলিয়াই কপিল তাহার হাতের ছড়িটা শিবমন্দিরের ইঁট-বাঁধানো শানের উপর চড়াম্ চড়াম্ করিয়া বারকতক বসাইয়া দিয়া আপনমনেই বলিতে লাগিল, "বল্ এবারে বল্—কেনা, কেনৌ, কেনাঃ! কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ! কেনেন, কেনেভ্যাম্, কেনেভ্যঃ! বাস্ ছুটি,—যা চলে যা।"

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে রাস্তার লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া কপিল আপনমনেই কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। কিন্তু এই যে এতগুলা লোক এখানে কেন জড় হইয়াছে, রাখহরির মাথাই বা ফাটিল কিসের জন্য, সে-সব বিষয় জানিবার কোনপ্রকার আগ্রহ-ঔৎসুক্যই তাহার দেখা গেল না।

কিয়দ্দূর গিয়া আবার সে সেইখানেই ফিরিয়া আসিল।

লোকজন সঙ্গে লইয়া আদালতে যাইবার জন্য তাহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কপিল হয়ত এতক্ষণ রাখহরিকে দেখিতে পায় নাই, এইবার সেইদিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "এই যে! বা! আচ্ছা হয়েছে রেখো, তোর আচ্ছা হয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,—পড়া হয়নি কেন শূয়ার! কেন তোর পড়া হয়নি সেই কথাই আগে শুনি।"

বলিতে বলিতে কপিল পুনরায় সেই স্কুলঘরের থার্ড-পণ্ডিতের ক্লাসটিতে গিয়া ঢুকিল।

ক্রমশ—

সাহিত্যে পতিতা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সমাজের এবং নীতির বিচারে যাহারা পতিতা, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকেরা সেই সব নারীচরিত্র লইয়া বিশেষভাবে শিল্পসৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা লইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যাহা প্রচলিত যাহা প্রথাগত, তাহাকে ডিঙাইয়া কোন কিছু গেলেই তাহা বিরুদ্ধ আলোচনার উদ্রেক করে, প্রাচীন চিরকালই নবীনকে সন্দেহের ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিকূল আলোচনা হইতেই কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায় না যে, কল্পসাহিত্যে এই যে পতিতা চরিত্রের আলোচনা—ইহা দূষণীয় কিনা।

সর্ব্বপ্রথম দেখা যাক যে, আপত্তি কি লইয়া। কেহ বলিতেছেন পতিতা যে, তাহাকে আঁকিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাকে ঘৃণিত করিয়া আঁক। যদি তাহা না কর, তবে ও সৃষ্টি অসত্য হইবে, অস্বাভাবিক হইবে; কারণ পাপীকে দেখিয়া ঘৃণা, পাপীর দণ্ড ও বিষময় পরিণাম—ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কেহ বলিতেছেন পতিতাকে মনোরম করিয়া আঁকা হইতেছে, পাপ লোভনীয় হইতেছে, ইহাতে পাঠকের রুচিবিকার জন্মিতেছে। ইহাতে মানুষকে পাপের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আবার অনেকে বলিতেছেন, পতিতা সমস্যাটা একটা মিথ্যা সমস্যা। ও কোথাও নাই। জগতে চিরকালই পতিতা রহিয়াছে ও থাকিবে; তাহাদের জন্য এই যে বেদনা ও সহানুভূতি ইহা উচ্ছ্বাসমাত্র, ইহার ফল আরো পতনমাত্র। যাহাদের জন্য এই ব্যথা তাহাদের উঠিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; বরং ব্যথা দেখাইতে গিয়া যুবকদের লোভে পড়িয়া পতন অনিবার্য্য। সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে, সুতরাং পতিতার প্রতি ঘৃণাকে প্রবল করিয়া তোলাই সমাজরক্ষার উপায়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে এই কয়টি বড় বড় আপত্তিই সমাজ স্বাস্থ্যরক্ষার নামে হইতেছে।

* * *

প্রথম কথা পতিতা-চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া। পতিতা পাপী। চোরও পাপী, যে দরিদ্রকে বেশি সুদে টাকা ধার দিয়া তাহার ঘরবাড়ি নীলাম করিয়া লয় সেও পাপী, যে ডাক্তার বেশি ভিজিট লইয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করে সে পাপী, যে উকীল মক্কেলকে ক্ষেপাইয়া বিদ্বেষ বহ্নিকে আরো বাড়াইয়া তোলে সেও পাপী, যে বণিক বিদেশী পণ্যে দেশ ভরে, সেও অনেকের বিচারে পাপী, যে ধনী শ্রমিক-সম্প্রদায়ের আলো-হাওয়া চুরি করিতেছে সে পাপী, যে গুরু ধর্ম্মের নামে শিষ্যের বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত হরণ করে সেও পাপী, এই সমস্ত পাপীর মধ্যে সেই নারী যে আপনার কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছে এবং হয়ত ফিরিবার এতটুকুও পথ না পাইয়া প্রবল পুরুষেরই ভোগের দাবী মিটাইবার জন্য পতিতা হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে সেও পাপী।

কিন্তু সব চেয়ে বড় পাপী ওই পতিতা নির্ব্বোধ নারী। সমাজ আর কাহাকেও ঘৃণা করিবার তীব্র আদেশ প্রচার করে নাই, কিন্তু কঠোরকণ্ঠে বলিয়াছে ওই পতিতার শাস্তি চাই, তাহাকে নিদারুণভাবে ঘৃণা করা চাই-ই চাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দেশ্যের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাতে আজো অনেকেরই কোনো সন্দেহ নাই।

তবু কারু কারু মনে সন্দেহ হইয়াছে, ইহাও সত্য কথা। তাঁহারা পতিতার ভুল ত্রুটি স্খলনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহার পাপের ওজন বাস্তবিকই

প্রাচীন সামাজিক মানদণ্ডে যতটা হইয়াছিল ততটা কিনা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক সময়ে চুরি করিলে হাত কাটিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে চুরি খুব কম হইত শোনা যায়। এখন চোরের শাস্তি কম, তাই চুরি বেশি হয়। তবু বোধকরি কেহই প্রাচীন দণ্ডনীতির পুনঃ প্রবর্ত্তন কামনা করেন না। তেমনি এক সময়ে পতিতার পতনকে, সমাজ খুব গুরুতর করিয়া দেখিয়াছিল, তাহাতে হয়ত সমাজ-ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। আজ অনেকেই উহাকে অন্যায় মনে করিলেও একেবারে "অতি ভীষণ" ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার প্রবৃত্তি অনেকের কমিয়া গিয়াছে। জুজুর ভয়ে শিশু বেশ শিষ্ট হয় কিন্তু মানুষ হয় না। তেমনি সামাজিক জুজু-ভীতিটাও কম হইয়া আসিলে হয়ত শিশুটি দুরন্ত হইবে কিন্তু নির্জ্জীব হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। এই সব কারণে পতিতাকে একটা অতি জঘন্য কিছু মনে না করিবার দিকেই বর্ত্তমান যুগের ঝোঁক। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিবার নিদারুণ আগ্রহও আজ কম। ইহাকে কেহ বলিতেছেন ঘোরতর অবনতি এবং সর্ব্বনাশের সূচনা, আর কেহ বলিতেছেন মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের ফল।

আরো কথা আছে। অনেকে পতিতার পাপকে বাস্তবিকই অতি ভয়ানক বিবেচনা করেন। তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রবচন ছাড়া যুক্তি বিশেষ কিছু নাই। আবার অনেকে বলেন, পাপ ভয়ানক না হইলেও অন্যে যাহাতে ইহাতে প্রবৃত্ত না হয় সেই জন্য পাপের শাস্তি বেশি হওয়া উচিত। রামকে লাঠিপেটা করিয়া (সামান্য কারণে) যেদো-মেধোকে সৎপথে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা শুভ, কিন্তু অন্যায় করিয়া ন্যায়কে রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তও মন্দ নহে!

আর এই যে দৃষ্টান্তস্বরূপ পতিতাকে হেয় করিয়া অতি দুঃখময় করিয়া দেখাইবার প্রয়াস ইহার অর্থ কি? অন্য শতসহস্র রকমের পাপী তো বেশ রাজা বাহাদুর খেতাব পাইয়া, দশ জনের মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া বেশ চলিয়া যায়, শুধু ওই নিঃসহায়া পতিতাই যদি ঘটনাচক্রে একটু সুস্থ শরীরে মারা যায় তাহা হইলেই জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়!

তারপর ঘৃণাটাই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, বা সব চেয়ে বড় কথা? যে পতিতার দিকে কেবলই ঘৃণা কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি সে কি আমার ঘৃণার যোগ্য? যে সমাজ তাহার ত্রাণের এতটুকু পথ করিতে পারে নাই, সেই সমাজের আমি কি তাহার ঘৃণার যোগ্য নই? সে তো পরের কথা, ঘৃণা কি একটা আদর্শ? না, করুণা এবং ভালবাসা? পাপকে, পতনকে পতন বলিয়াই মানিলাম, তবু যে পতিতা তাহার জন্য কি করুণা অসম্ভব?

*   *   *

'পতিতা' কথাটা ত তোমার গড়া কথা। তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে পতিত হইল সে কি তৎক্ষণাৎ অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া গেল? একটা সামান্য অপরাধ তাহার, তোমার দৃষ্টির সম্মুখে একটি ঘৃণার যবনিকা টানিয়া দিল, কিন্তু তাহার ভালমন্দ-মেশানো কল্যাণ-অকল্যাণের লাল-নীলের জীবনখানি বোনা ত বন্ধ হইয়া গেল না! তুমি তাহার ওই একফোঁটা কালির দিকে দৃষ্টিকে একাগ্র করিয়া কালো ছাড়া আর কিছুই না দেখিলেও তাহার জীবনে নীলের খেলাও চলিতেছে—তাহারও জীবনে কোথাও শুচিতা আছে, শক্তি আছে, দীপ্তি আছে, পুণ্য আছে। তুমি আপনার কামকে সমাজের কায়দায় বেশ রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে অন্য নাম দিয়া বেশ গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছ, পতিতা পারে নাই বলিয়াই কি সে নরকে পড়িয়া গেল? এই মিথ্যাকথা কতকাল বলিবে? পতিতার মনুষ্যত্ব নাই এ কথা না বলিলে কি ঘুম হইবে না?

না, 'পতিতা' তোমার আমার দশজনের চেয়ে বেশি পতিত মন লইয়া বাস করে না। তারও দয়া মায়া হয়, তারও ভগবানের কথা মনে পড়ে, তারও মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তারও ভালবাসা আছে, আত্মনিবেদন আছে, উৎসর্গ আছে—আত্মার সংগ্রাম আছে, পতন নাই।

'পতিতা'ও অবস্থাবিশেষে শ্রদ্ধা পাইতে পারে, পূজা পাইতে পারে। সুতরাং পতিতা নারী আমার আদর্শ না হইলেও, আমার ঘৃণার পাত্রীও নহে। ঘৃণা বস্তুটা আমার সত্যকে স্বীকার করিবার অশক্তি প্রমাণ করে মাত্র, ঘৃণা সত্যকে দেখাইতে পারে না।

জীবনকে সত্য করিয়া দেখিতে হইলে তাই পতিতা-কেও ভালমন্দের মিশ্রণ করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ জীবনকে দরদের সঙ্গে দেখিতে হইবে। ঘৃণার বাণে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য যাহার, সে জীবনকে সত্য করিয়া দেখিবার শক্তি রাখে না। বাণের ইঙ্গিত পাইলে হরিণ যে দাঁড়াইয়া দ্রষ্টার এবং হন্তার সম্মুখে খেলা করে না ইহা সকলেই জানে।

* * *

এইখানে আবার অনেকে বলিয়া উঠিবেন, জীবনকে সত্য করিয়া দেখিবার স্থান জুটিল কি ওই নিষিদ্ধ পল্লীতেই?

তার কারণ আছে। প্রথমতঃ জীবনকে যে কোথায় দেখিতে হইবে কোথায় না, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। সুবিধার গণ্ডীটাই চিরকাল সত্যের গণ্ডী নয়, জীবনেরও নয়। কল্পসাহিত্যিক আপনার জীবনের দেখা দিয়াই সত্যের মন্দির গড়িয়া তোলেন। এতকাল চোখ বুজিয়া প্রথাগত বুলি আওড়াইয়া কাল্পনিক-পতিতাকে দাঁড় করাইয়া তাহাকে খুব শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, আজ বাস্তবের পতিতা যদি ততটা শাস্তি লইতে না রাজি হয় তাহা হইলে উপায় কি?

বর্ত্তমান যুগে ওই যে হীন, হেয়, পতিত, ইতরকে লইয়া কল্পসৃষ্টি চলিয়াছে তাহার আরো একটা কারণ আছে। গ্রীকসভ্যতার মর্ম্মরপ্রাসাদ নাকি গড়িয়া তোলা হইয়াছিল বর্ব্বর দাসত্বের ভিত্তির উপর, ইউরোপীয় সভ্যতাও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে দুর্ব্বল জাতির দাসত্বের উপর, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াইয়া আছেন নিম্নজাতির হীনতার উপর। এই যে পরকে ছোট করিয়া রাখিয়া তাহারই উপর আপনার মহত্বকে গড়িয়া তোলা—এ কোন কালেই থাকে নাই, থাকিতে পারে না। বিশ্বময় তাই তাহার মরণ-ডঙ্কা বাজিয়াছে। তেমনি যুগ যুগ ধরিয়া পতিতার উপর দাঁড়াইয়া আছেন সমাজ-শুচিতা। অনেকে যুক্তি দেন, ইহা হইতে বাধ্য। একশ্রেণী পতিতা না থাকিলে সমাজই চলিবে না। কল্যাণের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অকল্যাণকে স্বীকার করাই চাই। বর্ত্তমান যুগের আত্মা ইহাকে অস্বীকার করিয়াছে। মানুষকে ঘৃণা করিয়া মানুষ ভাল হইবে, বড় হইবে, এর চেয়ে অপমানজনক পন্থা আর কিছুই নাই, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত। তাই আজ যারা ছোট, যারা হেয়, তারা সমান হইতে চায়—জীবনযাত্রীর সমান অধিকার তাহার। তাহাকে স্থান দাও।

* * *

ইহার অর্থ এই নহে যে, যে ছোট সে আজ আপনাকে বড় বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। তবে প্রতিক্রিয়া চির-কালই আতিশয্যের পথ দিয়া চলে। পতিতাকে ঘৃণ্য করিতে গিয়া একদিন সাহিত্যিকেরা যেমন মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন আজ তেমনি যদি বিপরীত দিকেও কিছু মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহাতে হাহাকার করিবার, জগৎটা পাপের পথে সরাসর নামিয়া যাইবে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না বলিয়া ভয় করিবার কিছু নাই। এই মাত্রাধিক্যের পশ্চাতে যে সত্য রহিয়াছে তাহাকে তা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সত্যটি এই—যে, পতিতাও মানুষ; নানা অবস্থার নিষ্পেষণে সে আজ পড়িয়াছে; সে পতন তাহার অশক্তি বটে কিন্তু পাপ নহে, গুরুতর অপরাধ নহে।

সমাজে নানা শ্রেণীর লোক আজ নানাভাবে অধঃ পতিত। তাহাদের অধঃপতনকে যখন কেহই গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করেন না, তখন এই পতিতাকেও ভয়ানক পাপী বলিয়া মনে করিবার বিশেষ যুক্তি নাই। অপরাধ-তত্বের আলোচনায় একথা বোধকরি স্বীকার্য্য যে, স্বভাবগত অপরাধ জগতে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যত কিছু অপরাধ তাহার অধিকাংশই মানুষ

বিশেষ অবস্থার চাপে করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং আজ পতিতার অপরাধকে যদি গুরুতর বলিতে হয় তবে সেই গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ী মানুষ সমগ্র-ভাবে; সমাজ, শাসনতন্ত্র তাহার জন্য দায়ী।

অনেকে বলেন সমাজ তো পাপ করিতে বলে নাই। যাহারা পতিতা, তাহারা পাপ করিয়াছে বলিয়াই দণ্ডভাগিনী। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহারা পতিতা তাহাদের পতনের জন্য পুরুষের সহকারিতার কোন প্রয়োজন আছে কিনা; আর যে নারী চিরকালই স্বভাবভীরু তাহাকে দুষ্কর্ম্মের দুঃসাহসিক পথে প্ররোচিত করিতে পুরুষের প্রবল প্রেরণা বেশি দায়ী কিনা। যদি তাহা হয় তাহা হইলে পতিতার যে বহিষ্কার এবং অস্পৃশ্যতা দণ্ড তাহা পুরুষকেও দেওয়া হয় না কেন?

এসব কথার পরে, সব কথাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বলিতে হয় যে, পতিতাসমস্যা বলিয়া কোনো সমস্যাই নাই। সমাজ-বিবর্ত্তনের অনিবার্য্য নিয়মে নাকি যাহার যেমন হওয়ার প্রয়োজন সে তেমনি হইয়াছে। জগতে পতিতা না হইলে সমাজ থাকিবে না। আর পতিতার জন্য মাথাব্যাথরই বা প্রয়োজন কোথায়? তাহারা তো বেশ আছে। এই মোটা কথাকয়টিকে বেশ দার্শনিক করিয়া বলিবার প্রবৃত্তি কোথাও কোথাও দেখা যায়।

যাহা যেমন আছে তাহা বেশ আছে, বেশ না হইলেও তাহাই হইতে বাধ্য—এসব কথা ঘোরতর অদৃষ্টবাদীর পক্ষেই সম্ভব, আর সে রকম খাঁটি অদৃষ্ট-বাদী একমাত্র জড়-জগতেই পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত কোনো অদৃষ্টবাদী ভাত আপনি মুখে আসিবে, আপনি তাহা চর্ব্বিত হইয়া গলা দিয়া গলিয়া যাইবে এমন সিদ্ধান্ত লইয়া চলেন নাই। সুতরাং মানুষের জীবনের স্বাভাবিক কথা হইতেছে এই যে, যাহা যেমন আছে তাহার তেমন থাকা উচিত নহে। যাহা কিছু অশোভন, অসঙ্গত, অন্যায়, তাহার সম্বন্ধে কেবলি সচেতন হইয়া চলা, ইহাই জীবন। যে আজ পতিতা সে হয়তো নিজের অবস্থা আজও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে সচেতন করিবার প্রয়োজন কি আর কাহারও নাই? চোর যখন চুরি করে তখন তো তাহাকে ভাল করিবার দায়িত্ব সমাজ এবং শাসনতন্ত্র উভয়েই অনুভব করেন। তাহ'কে তো এই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় না যে, সে আপনি যেদিন সচেতন হইবে সেই দিনই তাহার চেষ্টা সত্য হইবে? সুতরাং সমস্যার জাগরণের জন্য পঞ্জিকা দেখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে, যে অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সে অবস্থা অবাঞ্ছিত কিনা। এই যে সমাজে পতিতার একটা ঘৃণিত স্থান, ইহাকে প্রয়োজন বলিবার লজ্জা হইতে আজ মানুষ ত্রাণ পাইতে চায়, তাই সে পতিতাকে তাহার অন্ধকার ও দুর্দ্দশা হইতে উঠাইয়া আনিয়া মানুষের মর্য্যাদা ও স্থান দিতে চাহিতেছে; পতিতা সমস্যার এই মূল কথাটি কি অস্বীকার্য্য?

* * *

ফলকথা বর্ত্তমান যুগ, মানবচরিত্র বিচারের পদ্ধতি-টিকে একটু পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছে। ত্রিশ বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলেই সংসারধর্ম্মের গুরুতর দায়িত্ববোধ করিয়া যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন সমাজ তাঁহাদিগকে ব্যভিচারী বলিবেন না, কিন্তু যদি কোনো পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা অন্য কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলেই তাঁহাকে একেবারে নরকস্থ করিতে থাকিবেন এই মনোভাবকে বর্ত্তমান যুগ বরদাস্ত করিতে পারিবে না। শক্তিশালী পুরুষের এই যে জবরদস্তী, ইহা দীর্ঘকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। পুরুষের পতনকে ঢাকিয়া রাখিবার এবং তাহাকে নানাভাবে ধর্ম্মসম্মত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু নারীর কোনই ব্যবস্থা নাই। এমত অবস্থায় তাহার একটু ত্রুটিই তাহার জীবনকে চরম দুর্দ্দশার পথে টানিয়া লইয়া চলে। বর্ত্তমান যুগ সমাজ-ব্যবস্থাকে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে আহ্বান করিতেছে এবং সেই প্রেরণারই ফলে কল্প-সাহিত্যিক এই ঘোরতর অন্যায়ের দিকে দরদ

দিয়া দৃষ্টিপাত করিবার জন্য পাঠককে শিক্ষা দিতেছেন।

সমাজের উপরতলায় থাকিয়া যাঁহারা কেবলি নীচের তলার হাওয়া হইতে আপনাদের বাঁচাইবার জন্য চীৎকার করিয়া মরিতেছেন, তাঁহাদের এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, ওই নীচের তলাকে ভাল না করিয়া তাহাকে বাদ দিয়া রাখিবার কোনই উপায় নাই। সমাজের জীবনের প্রত্যেক অংশের জন্য অপর অংশ দায়ী। তাহার ভাল এবং মন্দ দুইই সমগ্র সমাজ-জীবনের ফল।

মরীচিকার পিছে—

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

ধূম্রতপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূর মরীচিকা তটে ছলনামায়ার তীরে
ছুটে যায় ছুটি আঁখি!
—কতদূর হায় বাকি!
উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে',
পথে পথে তার বাধা জমে যায়—তবু সে আসে না ফিরে!

দূরে,—দূরে,—আরো দূরে—আরো দূরে,—আরো দূরে,
অসীম মরুর পারাবার-পারে আকাশ-সীমানা-জুড়ে'
ভাসিয়াছে মরুতৃষা!
—হিয়া হারায়েছে দিশা,
কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশীর সুরে
কোন্ দিগন্তে নির্জ্জন কোন্ মৌন মায়াবী-পুরে!

কোন্ এক সুনীল দরিয়া সেথায় উথলিছে অনিবার!
—কান পেতে একা শুনেছে সে তার অপরূপ ঝঙ্কার,
ছোটে অঞ্জলি পেতে',
তৃষার নেশায় মেতে',
ঊষর ধূসর মরুর মাঝারে এমন খেয়াল কার!
খুলিয়া দিয়াছে মাতাল ঝর্ণা না জানি কে দিল্‌দার!

কে যেন রেখেছে সবুজঘাসের কোমল গালিচা পাতি!
যত খুন যত খারাবীর ঘোরে পরাণ আছিল মাতি'
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে',
স্বপন-আবেশে রেঙে'
আঁখি দুটি তার জৌলস-রাঙা হয়ে গেছে রাতারাতি!
কোন যেন এক জিন-সর্দ্দার সেজেছে তাহার সাথী।

কোন্ যেন পরী চেয়ে আছে দুটি চঞ্চল চোখ তুলে!
পাগলা হাওয়ায় অনিবার তার ওড়্না যেতেছে দুলে',
গেঁথে গোলাপের মালা
তাকায়ে রয়েছে বালা,
বিনায়ে দিয়েছে রাঙা নার্গিস্ কালো পশ্‌মিনা চুলে!
বসেছে বালিকা খর্জ্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।

ছুটিছে ক্লিষ্ট ক্লান্ত অশ্ব কশাঘাত-জর্জ্জর,
চারিদিকে তার বালুর পাথার,—মরুর হাওয়ার ঝড়;
নাহি শ্রান্তির লেশ,
সুদূর নিরুদ্দেশ—
অসীম কুহক পাতিয়া রেখেছে তাহার বুকের পর!
পথের ভালাসে পাগল সোয়ার হারায়ে ফেলেছে ঘর!

আঁখির পলকে পাহাড়ের পারে কোথা সে ছুটিয়া যায়!
চকিত আকাশ পায় না তাহার নাগাল খুঁজিয়া হায়!
ঝড়ের বাতাস মিছে
ছুটিছে তাহার পিছে!
মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়,—
সুরার ভালাসে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায়!

রায়তের কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা ঊর্দ্ধমূল অবাকশাখ। উপরের দিক থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে, অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলচে। শ্রীমান্ প্রমথর "রায়তের কথা" প'ড়ে আমার মনে হ'লো যে আমাদের পলিটিক্‌সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিষটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর-মহলে, কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্দ্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা, কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরছে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্ত মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে হাসচে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বলচে, "অদৃষ্ট!" দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্‌স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বলচে "কালমেঘ আর হেরব না গো দূতী।" তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চলচে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই" আজ তেমনি জোরেই বলচি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বলবার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি তার আওয়াজ বড় মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারী জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তারপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোন জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন, কী শব্দ-সম্বলে কী

অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চলত, তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মরবার জন্যে, আর যাদের অদ্য-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া ক'রে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক্ সিংহাসন, গড়া হোক্ মুকুট, খাড়া হোক্ রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্‌নি, তারপরে সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্‌স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাসের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আব-হাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে, সদ্য মুখস্থ, কেন না আমাদের কারখানা ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেণ্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্য মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা। পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব তারপরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো, আর আছে ওকালতীর দ্রংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে প্রমথর "রায়তের কথা" স্থানকাল পাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। সে ঘোড়ার সাম্‌নের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছে না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চায় সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। প্রমথর মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তাকে বলতে পারে, আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই, তারপরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে, যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। প্রমথর জানা উচিত ছিল হাল-আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্‌ল তৈরী, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্ত্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম টেবলের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। প্রমথ তার্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চায়, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। সে সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চায়। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসচে;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে অতি শীঘ্র পৌঁছান চাই। এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। প্রমথর "রায়তের কথা" সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা

যাচ্চে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মাল মসলার গায়ে ছাপ মারা আছে Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরখ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটা রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে, পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো, অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলচে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশে শাস্ত্রে বলে বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে যে সময় লাগে তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স্ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুল খেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে তার মধ্যে মাটসিনি গারিবালডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাটের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্ম্মুখের জয়; রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এল প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বলসেভিজ্‌ম ফাসিজ্‌ম প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্য্য-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডা তন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপর তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্ত্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্যই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলসেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ-মোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে ফোড়াটা বাঁ-হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায় তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টীরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম, সাহিত্যে ইসারা চলচে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিন্তহীনতা।

আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদেরও যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়ত শিকারের বিষয় পরিবর্ত্তন হবে কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে, কিন্তু কাল যখন, "জীবে দয়া"র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েচে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয় তাহলে তা'কে দ'লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেষা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেষা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জ্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, "রায়তের কথা"য় পুরাতন দফ্তর ঘেঁটে প্রমথ সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেচে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়ৎদের বলচি "প্রজা", তারা আমাদের বলচে "রাজা"; মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম চোর খেলার গোলাম যা'কেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্ত-পিপাসায় বড় জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। প্রমথ বলছে, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয় বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে, তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ আছে বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কি করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ব হবেই, কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ বিক্রি বেড়ে চলবে। এম্‌নি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার জমিদার মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেকে না। আমার অনেক রায়ৎকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েচে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কিনা সে তত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়ৎকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকৃত, তা হ'লে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি তা মনে করবার হেতু নেই। যে সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মুলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই, রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন স্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জালানো, ফসল-তছ্‌রূপ কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেল-খানায় যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইন-

টাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতী কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে মূঢ় রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকিবে? প্রমথর লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

আমি জানি জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোক্সান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয় এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ব-বৃদ্ধি নেই অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা, সুতরাং কেবল চাষী নয় সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ-কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যেই, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে, যাঁর জন্যে এত জোড়াতাড়া সে তত কাল পর্য্যন্ত টিঁকবে কিনা সন্দেহ।—ভারতী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সমাজের ভাবান্তর

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

একটা উজ্জ্বল আলোকের চারিদিকে পতঙ্গের দল যখন ঘুরিতে থাকে তখন তাহাদের গতির মধ্যে কেমন

একটা সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আলোকই প্রত্যেকের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত বাঁচাইয়া চলিতে তাহারা কেমন সাবধান হয় এবং অঙ্কশাস্ত্রের কত না বিচিত্র রেখার সমাবেশ সৃষ্টি করে। জীবমাত্রেরই আবেষ্টনের সহিত সম্বন্ধ এইরূপ দুই প্রকার। মুখ্য সম্বন্ধ আবেষ্টনের সহিত একটা বোঝাপড়া করা। কিন্তু বোঝাপড়া শুধু একটি জীবের নহে, অনেকগুলি জীবের। জীবগুলির মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা ঐক্য আছে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়ারও একটা সাদৃশ্য আছে। সব পতঙ্গগুলাই আলোকের খুব নিকটে সমানভাবে যাইতে চাহে। আবার আলোকের নিকটে যাইতে গিয়া প্রত্যেক পতঙ্গই সঙ্গীদিগের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সদা সচেষ্ট। জীবের ক্রমবিকাশের উর্দ্ধতর সোপানে একদিকে যেমন আবেষ্টনের সহিত আদান-প্রদান নিবিড় হয়, অপর দিকে পরস্পরের সহিত ব্যবহারেও একটা দান-প্রতিদানের অচ্ছেদ্য বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। এই দান-প্রতিদানই সমাজ-জীবনের উৎপত্তি। অপর দিকে সমাজ জীবনযাত্রার একই সঙ্গে আধার ও সহায় হয়। পিপীলিকা, মৌমাছি, বল্মীকের মধ্যে সামাজিক সমবায় বিশেষ সুদৃঢ় ও সর্ব্বতোমুখী হইয়াছে। বাসস্থান নির্ম্মাণ, খাদ্য অন্বেষণ, সঞ্চয় ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ বিষয়ে তাহারা এমন বংশপরম্পরালব্ধ রীতি-নীতি অবলম্বন করে যে, সেগুলি প্রাণরক্ষা হিসাবে প্রাথমিক প্রবৃত্তিমূলক ব্যবহারের মতই তাহাদের কল্যাণে লাগিয়াছে। পরস্পরের ব্যবহার-মূলক রীতি-নীতি এ-ক্ষেত্রে জীবন-নির্ব্বাহের শ্রেষ্ঠ সহায়তা করিতেছে।

মানুষ যখন বনে শিকার খুঁজে, গাছপালা পশুপক্ষীর সঙ্গে সে যেমন একটা যোগাযোগ স্থাপন করে, তাহার সঙ্গী শিকারীগুলির সঙ্গেও একটা ব্যাবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। আদিম মানুষের পক্ষে কোন্ গাছ সুখাদ্য, কোন্ গাছ অখাদ্য, কোন্ পশু শত্রু, কোন্‌টি মিত্র, কোন্‌টির বিষয়ে বা সে উদাসীন এই সম্বন্ধগুলি তাহার জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় ভাবে তাহার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি আদিম মানুষের সহিত গাছপালা ও পশু-পক্ষীর সম্বন্ধ এত প্রত্যক্ষ যে, তাহাদের নাম হইতে ও তাহাদের সহিত ব্যবহারের অনুযায়ী সে গোষ্ঠের সম্বন্ধ নির্ণয় করে। বিবাহের গণ্ডী ও সামাজিক আত্মীয়তা সবই বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু সম্বন্ধে মানুষের বিচারের উপর নির্ভর করে। বটগাছ, বেতবন, শঙ্খচীল বা কচ্ছপ হইতে মানুষের এক সমাজের নাম হইল, অমনি অন্য জাতির সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা বা বিবাহের গোষ্ঠ ইহা হইতেই নিরূপিত হইয়া গেল। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে বংশের উদ্ভব স্বীকৃত হইল, অমনি মানুষের সহিত অপর মানুষের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পক্ষান্তরে জীব-জন্তু গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি মানুষের ব্যবহারেও কোথায় শ্রদ্ধা, কোথায় পূজা, কোথায়ও বা ঘৃণা লক্ষিত হইল।

বিশেষতঃ খাদ্য মানুষের সহিত তাহার বেষ্টনীর প্রধান বন্ধন। খাদ্য-সংগ্রহের মধ্যে আদিম মানুষ বিশ্ব-শক্তিকে অনুভব করে, তাহাকে নানা উপায়ে পূজা সম্বর্দ্ধনা করে। শিকারী জাতি বন্য পশু মারিয়া তাহাদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করে, নদী বা সমুদ্রবাসী মাছ ধরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বিপুল উৎসবে যোগদান করে; কৃষক-স্ত্রীও দেশে দেশে ভূমিলক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করে—কখনও নগ্ন মূর্ত্তিতে অমাবস্যার রাত্রিতে মাঠে মাঠে নৃত্য করিয়া, কখনও বা কঠোর উপবাস করিয়া, কখনও বা ফসল কাটার পর নবান্নের ভূরি-ভোজনোৎসবে আত্মীয় পরিজনকে পরিতৃপ্ত করিয়া।

মাতা বসুন্ধরা, গোমাতা, মা গঙ্গা, পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রসূর্য্য, বাস্তুভিটার মা মনসা, ষষ্ঠীতলার চিরন্তন অশ্বত্থ-বট, মাঠ-পারের শাদা বুড়ো পাহাড়, নবীপারের চক্রবাক চক্রবাকী, আকাশের ধ্রুবতারা, বাগানের সাত ভাই চম্পা,—এমনি করিয়া মানুষের যুগে যুগে নাম, প্রতীক ও উপাসনার উপকরণ যোগাইয়াছে। মানুষের বিচিত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ম-কানুন, কথা-উপকথা, গান-উৎসব, স্বপ্ন-কাব্যের সঙ্গে এইরূপে নদী-পাহাড়, জীব-জন্তু, গাছপালা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এক একটা দেশে এক একটা

সভ্যতা এমনি করিয়া নানা ভাব ও অনুভূতির সমষ্টিকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র ভাবে দেখা দেয়। আদিম যুগে কখনও তাহা শিকারের বৈচিত্র্যের উপর নূতন কাঠামো দেখা দেয়। যেমন শিল ও ভালুক অথবা হরিণ ও বুনো মহিষ শিকারের উপর বিভিন্ন শিকারী সভ্যতার অভ্যুত্থান। কখন বা ভিন্ন ভিন্ন পশুপালনের উপর বিভিন্ন পশুজীবী সভ্যতার উৎপত্তি। ঘোড়া, গরু, মহিষ, রেন্‌ডিয়ার পালনের উপর ভিন্ন ভিন্ন পশুজীবী সভ্যতার বিকাশ দেখা গিয়াছে। আবার কখনও বা খাদ্য-শস্য বিশেষের উপর সমাজের বিশিষ্ট ছাঁদ, বিশিষ্ট নিয়মকানুন নির্ভর করিয়াছে। ভাতের জন্মকথার সহিত গমের জন্মকথার অনেক পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া ও পশ্চিম জগতের সমাজের ব্যবধান জড়িত। সেইরূপ পূর্ব্ব-জগতে নারিকেল-দ্বীপ-পুঞ্জে নারিকেল ও নূতন মহাদেশে ভুট্টা চাষকে অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন সমাজ-জীবন, বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বুদ্ধি ও সৃজনী শক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাত্রা বন-জঙ্গল নদী-পাহাড় বা বন্যজন্তুর সহিত অফুরন্ত সংগ্রামে নিঃশেষ না হইয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কৃষকের মনের উপর বন্য-জন্তুর প্রভাব ক্রমশঃ কমিতে থাকে। যখন কৃষি আরম্ভ হইল, তখন মেঘ ও রৌদ্র, জল ও আকাশ, ঋতু ও ফসল মানুষের মন ও হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। নূতন ভাব, অনুভূতি ও কল্পনায় রঙীন হইয়া আবার একটা নূতন রংয়ের সূতা তৈয়ার হইল। সব কৃষিপ্রধান সভ্যতা প্রায় এক রঙের সূতায় বুনা—যদিও ঋতুপরিবর্ত্তন, জলসেচন, লাঙ্গলের পশু অথবা ফসলের পর্য্যায় বিচিত্র ভাবে কৃষক সমাজের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ম-কানুন তৈয়ার করে। আমাদের দেশে কৃষির সম্পদ মানুষের অপেক্ষা প্রকৃতির শক্তির উপর নির্ভর করে। সোনা জমিতে নহে—আকাশে ফলে। সেইজন্য বর্ষার প্রারম্ভে পল্লী-সমাজে এত উৎসব-আনন্দ। দুর্ভাবনাও কম নহে, তাই নবরাত্রির দীর্ঘ উপবাস। কৃষির দেবতা রক্তলোলুপা ভূমি-দেবতা, তাহার উৎপাদিকা শক্তিকে নানা রীতি-পার্ব্বণে বোধন করিয়া মানুষ ক্ষেত্রের ফসল কামনা করে; দেশে দেশে তাহার কত বিবিধ উপচারে পূজা। কৃষির দেশে রাজর্ষি স্বয়ং লাঙ্গল চালাইয়া লাঙ্গলের ফালে বসুন্ধরার কন্যাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। লক্ষ্মী গৃহে গৃহে বীজশস্যের মাঙ্গলিক ভাণ্ড অঙ্কে রাখিয়াছেন। ভূমির উর্ব্বরতা যে নারীত্বের সার্থকতার মত। আবার যখন দুর্ভিক্ষের সময় মাঠ ধূ-ধূ করে, ফসল পুড়িয়া ছাই হয়, তখন তিনি শাকম্ভরী হইয়া বনজাত শাকের দ্বারা জাতিকে পোষণ করেন। কৃষক জাতির ঋষি মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদে নদীকে কঠিন গিরি-কন্দর হইতে অবতরণ করাইয়া লোকপূজ্য হইয়াছেন। দেবতা রাখালরাজ বেশে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। পঙ্কিল দূষিত দহে যেখানে মারীভয় দেখা গিয়াছে সেখানেও তিনি শিশু-প্রতিপালক, কাতরভয়-ভঞ্জন। চীনা দেবতাও ঠিক তেমনি করিয়া জলাভূমির মারীভয় হইতে মানুষকে রক্ষা করেন, পাহাড় কাটিয়া জলসেচের নূতন পথ উন্মুক্ত করেন। গো, গঙ্গা মাঈ, ভূমি দেবী, ধান্যলক্ষ্মী, রাখাল-দেবতা এখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও পরিশ্রমকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; মানুষের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধেও তাহাদের প্রত্যেকের প্রভাব বর্ত্তমান।

মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বিধি-নিষেধ, ভাবনা-কল্পনা তাহার হাত-পা লাঙ্গল বলদের মতই এখানে কৃষির কাজের সহায়। সভ্যতার আদব-কায়দাকে মানুষ ঠিক যেন হাতিয়ারের মত তাহার জীবন-যাত্রার সহায় রূপে পাইয়াছে। মানুষ নিজে লাঙ্গল ঠেলিতে পারে না, তাই গরুর প্রতিপালন আবশ্যক। গরু তাই পূজার সামগ্রী। গোময় পবিত্র, কারণ গোময়ের দ্বারা যুগ-পরম্পরা-কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। বার মাসের তের পার্ব্বণ করিয়া মানুষ প্রকৃতির অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া কৃষিকার্য্যে লাগে অথবা প্রকৃতির দান মাথায় তুলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করে। বাপ-পিতামহের নিকট হইতে যেমন চাষী তাহার কৃষির প্রণালী ও ফসলের পর্য্যায়

লাভ করিয়াছে তেমনি সে অর্জ্জন করিয়াছে কতকগুলি বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার, নিয়মকানুন, পূজাপার্ব্বণ। এইগুলি প্রাথমিক প্রবৃত্তিনিচয়েরই মত মানুষের জন্য কতকগুলি সহজ ও সরল কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অভ্যাস অনুযায়ী নিয়মকানুন পালন করিলে তাহার জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ সুবিধা। লাঙ্গল যেমন মানুষের অতি আবশ্যক হাতিয়ার, তেমনি সভ্যতা জিনিষটাও তাহার হস্তচালিত যন্ত্রের মত জীবন-সংগ্রামের সহায়।

কৃষির পর ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানা হইল। মানুষ কাঁচা মাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। জন্তু বা গাছপালার সহিত মানুষের দেখা সাক্ষাৎ নাই, অথচ তাহারাই কাঁচামালের উপাদান জোগাইয়াছে আর এই সকল উপাদানের অবলম্বনে মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। নানা লোকের সমাগমে যেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল, সেখানে নগর বসিল। মানুষের ভয় ভাবনা, কল্পনা, গাছপালা, বন্যজন্তু, ফসল বা ঋতু-পর্য্যায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল। মানুষ এখন মানুষকে লইয়াই ব্যস্ত। কারণ প্রকৃতি নহে—মানুষেই তাহার রক্ষক বা ভক্ষক। আগে সে আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘের রুদ্র অথবা শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিয়াছিল. ষড়ঋতুর বিচিত্র লীলার সহিত তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, এখন তেমনি ভয়ে ভয়ে সে কারখানা বা ব্যবসার সর্দ্দার ও মনিবের দিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহার ক্রোধ ও দয়ার উপরই যে তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে; অথবা শ্রমিকের দলের নূতন নিয়মকানুনের সহিত আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে থাকে।

জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষের সহিত প্রকৃতির নহে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বা শ্রেণী ও সঙ্ঘের দান প্রতিদানেই এখন জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। দল তৈয়ারী হইতে লাগিল। কৃষক স্বভাবতই একলা মাঠে পরিশ্রম করে; পরিশ্রমের ফল একাই ভোগ করে। কৃষক স্বাবলম্বী, আত্মম্ভরী। শ্রমিক পরমুখাপেক্ষী, শ্রেণীবদ্ধ। কারখানার যুগে জোট না বাঁধিলে জীবনরক্ষা অসম্ভব। দল মানুষের জীবনযাত্রার আধার ও আশ্রয়। নাম, প্রতীক, আদব-কায়দা, নিয়মকানুন সবই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিল।

বিপদ হইল, মানুষ ইহাতে কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। যখন প্রাথমিক প্রবৃত্তি-নিচয়ের সরল নির্দ্দেশে মানুষ চলিতে পারে না, তখন তাহার জীবন দুর্ব্বহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনী-শক্তিও হারাইয়া বসে। প্রাথমিক বৃত্তিসমুদায়ের সহজ ও সরল স্ফুরণ চরিত্র-গঠনের ভিত্তি। তাহা নূতন জীবনযাত্রায় একরূপ অসম্ভব! পল্লীগ্রামে সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায় গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিল্পের সহিত নিজ সৃজনীশক্তির, দৈনন্দিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। মানুষ শিল্পী হইয়া হাতুড়ী পেটে, পরিবারবর্গ শ্রমের সহায় হয় ও তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করে। পূজা-পার্ব্বণের দিন স্বজাতির মন্দিরে যাইয়া সে উৎসব করে, এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ, আদব-কায়দায় একটা বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও আপনাকে চরিতার্থ করে। কারখানার দলের শ্রমিক নিছক শ্রমিক। তাহার সৃজনীশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, জন-সমাকীর্ণ বস্তিতে তাহার পারিবারিক জীবনের শ্রী পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব; ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পূজা-পার্ব্বণ সভ্যতা-ভব্যতা সে গ্রামে পরিত্যাগ করিয়া আসে। দলের জীবন তাহার একবারে নিছক খাওয়া পরার জীবন, তাহাতে তাহার বিচিত্র বৃত্তি অনুভূতিগুলি প্রকাশ পায় না। তাহার প্রাণশক্তি, চরিত্রের সামর্থ্য সমাজ হরণ করিল।

শ্রমিকের জীবন তাই এত নিরানন্দ, অস্বাভাবিক। যেখানে সর্ব্বাঙ্গীন জীবনের অধিকার মানুষ হারায় সেখানে সে দুর্দ্দমনীয় আক্রোশে গুমরিতে থাকে, নিদারুণ ব্যথায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে শেষে পশু হইয়া দাঁড়ায়।

তাহার দল বা সমাজ তাহার আত্মরক্ষার সহায় না হইয়া আত্মদ্রোহের ইন্ধন যোগায়। তাই দেখিতেছি, আমাদের দেশের বস্তি-জীবন মানুষকে পশু বানাইতেছে, স্ত্রীকে অসতী করিতেছে, শিশুর লজ্জা ও পবিত্রতা হরণ করিতেছে। পল্লীজীবনের সহিত শ্রমিকের বস্তি-জীবনের ভাব ও প্রণালীর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই বিচ্ছেদ সে নিবারণ করিতে চাহিয়াছে কত না উপায়ে। কখনও পঞ্চায়েত সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর শ্রমিক বিবাদ-নিষ্পত্তি পাপ নিবারণের ভার দিয়াছে, কখনও বা বস্তির ঘরের সম্মুখে এক টুকরা জমির উপর কয়েকটা গাঁদা গাছের শোভায় সে ধূলি-ধূসর প্রকৃতিকে বরণ করিয়াছে; কখনও সে কথক আনিয়া পল্লীগ্রামের সহজ সরল নৈতিক জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কখনও গোবর-লেপা প্রাঙ্গণে হনুমান প্রতিষ্ঠা বা তুলসীমঞ্চ স্থাপন করিয়া সে আপনার স্বধর্ম্মকে স্মরণ করিয়াছে, কখনও বা তাহার ভগিনীকে মেষ বা ছাগলশিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া স্বজন-সুখ লাভ করিয়াছে। কিন্তু অধিক স্থলেই পাপের পৈশাচিক লীলা, পুরুষের পৌরুষত্ব হানি, নারীত্বের অপমান, শিশুত্বের অকাল লাঞ্ছনা।

নবীন কবি কাঁদিয়াছেন—

যন্ত্রযানের চক্রপেষণে পিষ্ট হতেছে কত,
এই হাসে খেলে, এই মরে যায়—ভেল্কীবাজীর মত।
কলের দৈত্য-ক্ষুধা মিটাইতে যাহারা চলেছে আজি,
তারা কাল পথে বাহিরায় যত খঞ্জ আতুর সাজি।
মাতাল পতি ও পত্নীতে যত বস্তিতে আজি হায়;
চীৎকার আর হানাহানি ছি-ছি গালাগালি বিনিময়।
দুটি ফোঁটা জলে ভিজিছে মৌন আঁখি,
শুধু আমি হায় চুপ করে চেয়ে থাকি।

কৃষিজীবনের সহিত মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাঠ ও জলের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিতে করিতে এমন একটা সভ্যতা মানুষ গড়িয়াছে, যাহা একই সঙ্গে তাহার জীবনযাত্রার বহুযুগসঞ্চিত ফল ও সহায়স্বরূপ। কারখানার আবেষ্টনে মানুষ এখন পর্য্যন্ত বিশ্বশক্তি হজম করিতে পারিল না, এমন একটা আধার ও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না, যাহা প্রতিকূল জড়শক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করে, যন্ত্রতন্ত্রের উপর আত্মার প্রভাব স্থাপনের পরিচয় দেয়।

জীবজগতে দেখা যায় গৃহপালিত জন্তুরা অনেক সময়ই অবনতির পথে অগ্রসর হয়। কৃত্রিম আবহাওয়ায় তাহারা বেঢপ, বেমানান, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। রোগ বীজাণুরাও অপেক্ষাকৃত সহজেই দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে পারে। কৃত্রিম আবেষ্টনে পড়িয়া মানুষেরও তাহাই হইতেছে। সহরের বস্তিতে শারীরিক অবনতি, জন্ম-হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, নির্য্যাতিত প্রাণশক্তি, সবই মানুষের পতনেরই পরিচায়ক। মানুষ নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে যুঝিতে পারিতেছে না। তাহার যে আচার-ব্যবহারের ঢাল ও বর্ম্ম ছিল, কৃষি-জীবনে তাহা কাজে লাগিত, বর্ত্তমান যন্ত্রচালিত মাল-মসলার অমানুষিক জীবনযাত্রায় তাহা তাহার সহায় হইল না। তাই সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইতেছে; স্বাস্থ্যহানি, দুর্নীতিপরায়ণতা ও সমাজ-দ্রোহিতা সবই তাহার অকৃতকার্য্যতার সাক্ষী।

দলবদ্ধ হইয়া মানুষকে এখন নূতন সামাজিক অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে তবেই তাহার রক্ষা। যেখানে যে বৃত্তিগুলি প্রতিকূল জড়-শক্তির চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে সেখানেই নূতন কেন্দ্র নূতন ভাব ও অনুষ্ঠান মানুষকে তৈয়ার করিতেই হইবে। আমোদ-প্রমোদ, আদব-কায়দা, পূজা-পার্ব্বণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম পর্য্যন্ত নূতন ছাঁচে আবার তাহাকে ঢালাই করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতিকে মানুষ জয় করিয়াছিল, সম্মুখ সংগ্রামে নহে, তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া। তাই প্রকৃতি কোলে করিয়া সস্নেহে তাহার জীবন চরিতার্থ করিয়াছে। একটা অনধিগম্য নিয়তির কল্পনা কৃষকের বিপুল ব্যর্থতাকে বিদ্রোহের ইন্ধন জ্বালাইতে দেয় নাই। মানুষ এখন প্রকৃতির স্নেহকোল ছাড়িয়া মানুষেরই হস্ত চালিত যন্ত্রের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। একটা বিরাট অনধিগম্য যন্ত্রযানের সে একটি ঘূর্ণায়মান চক্রমাত্র।

যন্ত্রের ঘূর্ণীপাকের সহিত তাহার প্রাণ-শক্তিকে তাল রাখিতেই হইবে। তাহাতে তাহার হাড়-মাস পিষিয়া যাউক, যন্ত্র সে বিষয়ে অবিচল, তাহাতে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি, ভাব ও কল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হউক, যন্ত্র সে বিষয়ে হৃদয়হীন। এই অনতিক্রম্য, অমানুষিক শক্তির আয়ত্তাধীনে মানুষ একেবারে মূঢ়, মূক, অসহায়।

প্রকৃতির হৃদয় সে জয় করিয়াছিল পূজা-পার্ব্বণের দ্বারা। প্রকৃতিও তাই তাহাকে আপনার পরাজয়ের কৌশল শিখাইয়াছিল, তাহার হাতে আপনার পরাভব-যন্ত্র তুলিয়া দিয়া তাহাকে বানাইয়াছিল হল-ধর।

হল-ধর যে যন্ত্র-ধর হইতে পারেন নাই। বিশ্বকর্ম্মা যে কুটীর-শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ রহিলেন। রাখালরাজ যে গোচারণ-মাঠেই রহিয়া গেলেন, কোলাহলমুখরিত নাগরিক জীবনে যে তাঁহার বাঁশীর মোহন স্বর শুনা গেল না। বাঁশীর স্বরে একবার নদী উজান বহিয়াছিল। যন্ত্র-বিজ্ঞানের যৌবন জল-তরঙ্গ রোধ করিবে কে? ভারত-বর্ষ সেই নিতুই নবেরই ধ্যান করুক, যিনি কংস-কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবের পাষাণ গুরুভার মোচন করিবেন, পাষাণ স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর বিরাট মিথ্যার প্রাসাদ ধূলিসাৎ করিবেন, আনন্দবনে দাঁড়াইয়া মন-যমুনাকে আবার উজান বহাইবেন, আপনার মোহন কণ্ঠে চির-মুক্তির বাণী, অধর্ম্মের গ্লানির চির-অভিশাপ বহন করিয়া। চাই শ্রমের আনন্দ, চাই মুক্তি, চাই সহজ স্বাধীন জীবন, বিশ্বময় যন্ত্র-প্রপীড়িত, অপ্রাকৃত জীবন হইতে অসীম ক্রন্দন শুনা যাইতেছে, তাহাতে মিশিয়াছে দেশ-দেশান্তরের কত রোগ কাতর শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ, কত অসহায় বিপন্ন নারীর ব্যর্থ অভিশাপ, কত লাঞ্ছিত বিপর্য্যস্ত শ্রমিকের নিষ্ফল বিলাপ। যিনি আসিতেছেন তিনি নূতন সভ্যতার বাণী লইয়া আসিতেছেন, নূতন ধর্ম্ম নূতন কর্ম্মের তিনিই উদ্যোক্তা। তাঁহার নূতন গীতা মহা-ভারতের নহে, বিশ্ব-ভারতেরও শাস্ত্র হইবে।

—উত্তরা, বৈশাখ, ১৩৩৩

স্কন্ধকাটা সমাজ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবশিশুর ঘাড়ের উপর হাতীর মুণ্ড জোড়া দিয়া গণেশ ঠাকুরের সৃষ্টি হইয়াছিল! দেবসমাজে হয়ত এ রকম জোড়াতালি দিয়া আস্ত একটা দেবতা সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু মনুষ্য সমাজে তা চলে না। একটা সমাজ যখন আর একটা সমাজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসে তখন দুইটা যদি এক ভাবাপন্ন হয় ত ক্রমশঃ দুইটা মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইংলণ্ডে নর্ম্যান আর স্যাকসন মিলিয়া এই রকম একটা নূতন ইংরেজ সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার কারণ দুইটা সমাজই ছিল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের পরস্পরের রক্তের মিলনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষে তা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কৃষ্ণকায় ভারতবর্ষের কাঁধের উপর শ্বেতকায় ইংরাজের মাথা বসাইয়া দিয়া যে State গড়িবার সঙ্কল্পের কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অসম্ভব এই জন্য যে, এই ভিন্ন ভিন্ন সমাজদেহের এই দুইটা টুকরা পরস্পর মিশিয়া গিয়া একটা নূতন সমাজ গড়িবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষকে দেবলোকে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখেন, যাঁহারা কথায় কথায় Divine Democracyর দোহাই দেন তাঁহারা কল্পনার জোরে সব কিছুই করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদের দেহে মানুষের রক্ত মাংস বিদ্যমান, তাঁহাদের এই সুখস্বপ্ন ভোগ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হয় আমাদের নিজেদের মাথা গজাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজে পরিণত হইতে হয়, নয়ত চিরদিন ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। এই দুইটা কথাই বুঝিতে পারি; কিন্তু Dominion Status-এর কথা শুনিলেই গণেশ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে।

* * *

আমাদের নিজেদের সমাজটা একটা homogenous সমাজ নয়। হিন্দু সমাজ বলিয়া আজকাল আমরা যাহার

উল্লেখ করি তাহার নামকরণ হইয়াছে ভারতবর্ষ পরাধীন হইবার পর। যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এ দেশের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা এদেশের লোককে বলিত হিন্দু। তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও গঠন প্রণালী এদেশের লোকের সামাজিক গঠন প্রণালী হইতে ভিন্ন; সুতরাং এদেশের লোক নিজেদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিবার দরকার হইলে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিত; এবং যাহা অমুসলমান তাহারই নাম হইয়া দাঁড়াইল হিন্দু। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন পৃথক সমাজের সমাবেশ মাত্র। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রক্তের টান নাই, প্রাণের টানও খুব বেশী নাই। ইংরাজের ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের নাম হইয়াছে অ-মুসলমান, কথাটা শুনিলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এক এক সময় মনে হয় কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এখনও সামাজিক কথা উঠিলে সমাজ বলিতে ব্রাহ্মণ সমাজ, কায়স্থ সমাজ, বৈদ্য সমাজ বা এইরূপ খণ্ডগুলিকেই বুঝেন। এক ভাবাপন্ন, এক রীতিনীতি বিশিষ্ট, এক প্রাণশক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত কোন একটা প্রকাণ্ড সমাজের কথা তাঁহাদের মনে উঠে না। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন একটা সমাজ আমাদের দেশে গড়িয়া উঠে নাই। বিদেশীর চাপে পড়িয়া আমরা কতকটা কাছাকাছি হইয়াছি; কিন্তু সব খণ্ড-সমাজগুলি মিশিয়া একটা প্রকাণ্ড সমাজে পরিণত হই নাই।

* * * *

কেন এমন হইয়াছে তাহা বুঝিতে গেলে অতীত ইতিহাস খুঁজিতে হয়। পুরাকালে আর্য্যসমাজের সহিত অনার্য্য সমাজের যে কি সম্বন্ধ ছিল, দ্বিজেরা শূদ্রের প্রতি কেমন ব্যবহার করিতেন তাহা মনুসংহিতা পড়িলে এখনও বুঝিতে পারা যায়। তুই একজন রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিতালি করিয়া চণ্ডাল বংশকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু গুহকের বংশধরেরা আজ পর্য্যন্ত চণ্ডালই রহিয়া গিয়াছে আর রামচন্দ্রের বংশধরেরা সীতা-উদ্ধারের পর যে গুহকের বংশধরদের জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের খাতিরে একলব্য বেচারার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিলেন। একলব্যের উচিত ছিল গুরুদেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান, তা না করিয়া তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কাটিয়া দিলেন। এত প্রবল গুরুভক্তির ফলেও তাঁহার চণ্ডালত্ব ঘুচিল না। সূত পুত্র মনে করিয়া অর্জ্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধই করিলেন না। এ সব ব্যাপার পড়িলে আজকালকার দক্ষিণ আফ্রিকার কথা মনে পড়ে। মনে হয় প্রাচীন কালে মুষ্টিমেয় আর্য্যসমাজ এমনি করিয়া একটা প্রকাণ্ড শূদ্র সমাজের ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছিল। বাংলাদেশে আজও তাহারই ফলে হিন্দুদের মধ্যে অর্দ্ধেক জল অনাচরণীয়। শূদ্র সমাজের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন আর যাঁহারা বর্ণসঙ্কর, তাঁহারাই হইয়াছিলেন সংশূদ্র। বাকি সব অন্ত্যজ। এই শূদ্রেরাও এক সমাজভুক্ত ছিলেন না। নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত জাতিগুলি বাংলার আদিম অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন tribes-এর বংশধর। আর্য্যদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত হইলে যে সমস্ত শূদ্র বিজেতাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতেন তাঁহাদের আদর একটু বাড়িত। প্রবাদ আছে পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন যে সমস্ত শূদ্র তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন তিনি তাঁহাদের নব-শায়ক নাম দেন। তাহা হইতেই বর্ত্তমান নবশাখের সৃষ্টি।

ক্ষত্রিয় রাজাদের সময় দেশের অধিবাসীরা এই রকম ছোট ছোট সমাজে বিভক্ত ছিল। আর্য্যেরা ছিলেন স্বাধীন, আর শূদ্রেরা ছিলেন পরাধীন। আজকাল আমরা গবেষণা করি যে এত বড় একটা দেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে পরাধীন হইল কেমন করিয়া! কিন্তু একথা ভাবিয়া দেখি না যে দেশের অধিকাংশ লোক চিরদিনই পরাধীন। ক্ষত্রিয়ের জায়গায় পাঠান বসিল

কি মোগল বসিল, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার বা তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার তাহাদের কোন কারণই ছিল না। আজকাল ইউরোপে শ্রমিকদের মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছে—The fatherland is in danger. What is that to us ?—স্বদেশ বিদেশীর দ্বারা যদি আক্রান্ত হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? অর্থাৎ দেশের উপর যেই রাজত্ব করুক না কেন, দেশের লোকই প্রভুত্ব করুক আর বিদেশীই প্রভুত্ব করুক, গরীবদের জন্য সেই ঘাস জলের ব্যবস্থাই থাকিবে। সেকালের শূদ্রদেরও অবস্থা ছিল ঠিক তাই। দেশের মালিক ছিলেন ক্ষত্রিয়; সুতরাং দেশ রক্ষা করা বা না করা তাঁহার কাজ। তাহার লাভক্ষতির চিন্তা তিনিই করিবেন—অপরের তাহাতে কি? এ কথা যে কল্পনা নয়, একেবারে খাঁটি সত্য, তাহা আজকাল ক্ষত্রিয় রাজাদের অধীন দুই একটা দেশ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। রেওয়ার রাজা ক্ষত্রিয়—বাঘেল ঠাকুর। তাঁহার রাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত যে বাঘেল ঠাকুরেরা যখন রাস্তা দিয়া চলিবেন তখন জনসাধারণকে সে রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইতে হইবে। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের মনে আজকাল যাহাকে Nationalism বলে তাহা গজাইবে কোথা হইতে?

* * * *

হিন্দু রাজাদের আমলের স্বাধীন ভারত বলিয়া আমরা যে জিনিষটাকে কল্পনা করি তাহা ছিল এই গণেশ ঠাকুরের মত এক জিনিষ। দেশের মাথার উপর ছিলেন আর্য্যদের প্রতিভূ স্বরূপ ক্ষত্রিয় রাজা, আর তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া ছিল একটা প্রকাণ্ড পরাধীন শূদ্র সমাজ। আর্য্য সভ্যতা হয়ত খুব একটা বড় জিনিষ; কিন্তু তাহা যে ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে এক সমাজবদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহা ত চোখের উপরেই দেখিতে পাইতেছি। মোগল বা পাঠান যে এদেশে বাদশা হইয়া বসিয়াছিল তাহার মূল এইখানে। মোগল পাঠান এদেশে অনেক অত্যাচার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের চেয়ে কম অত্যাচার করিয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে দেশটাকে নিক্ষত্রিয় করিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে।

* * * *

দেশের ইতিহাসে যতদূর দেখিতে পাই, নৈবেদ্যের উপরকার মণ্ডার মত এক একটা ক্ষুদ্র সমাজ এই প্রকাণ্ড দেশটার ঘাড়ে চড়িয়া আছে। ইংরেজ সেই মণ্ডাদের মধ্যেই একটি মণ্ডা। রাগ করিতে হয় ত আগাগোড়া সকলেরই উপর রাগিতে হয়। শুধু মোগল, পাঠান বা ইংরেজের উপর রাগিয়া কোন লাভ নাই।

* * * *

আমার সেই জন্য মনে হয় যে শুধু নৈবেদ্যের মণ্ডা বদলাইলে চলিবে না। এ দেশকে যদি স্বাধীন করিতে হয় ত একেবারে নূতন করিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে। এ দেশে এমন এক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার প্রত্যেক ব্যষ্টিই স্বাধীন, যাহা শতধা বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী নয়, পরন্তু প্রাণবন্ত ও আত্মরক্ষায় সমর্থ। আজকাল আমরা যে চেষ্টায় ব্যাপৃত তাহা নিতান্তই ভাসা ভাসা; তাহা উঠিতেও দেরী হয় না, ভাঙ্গিয়া পড়িতেও দেরী হয় না। কি ভিত্তির উপর সেই নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে তাহাই আমাদের বিচার্য্য।—আত্মশক্তি, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

গোপন ধারা

শ্রী নীলিমা বসু

বোর্ডিংএর ঘণ্টা বাজিল।

খাবার ঘরে মেয়েদের ঠেলাঠেলি, কে কোথায় বসিবে ঠিক করিয়া লইতেছে।

সকলে বসিলে পর, অন্ধকার কোণে যে স্থানটুকু অবশিষ্ট রহিল, পূর্ণিমা ধীরে ধীরে সেইখানে গিয়া বসিল।

সোমবার। পারিজাতের পরিবেশনের দিন। কোমরে কাপড়-জড়ানো, লম্বা চুলের গোছা অস্বাভাবিকভাবে উপরে তুলিয়া বাঁধা,—ভাতের প্রকাণ্ড গামলা-হাতে এদিক-ওদিক করিতে করিতে পারিজাত একবারে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

—আই কাণ্ট, আই কাণ্ট, বাপরে, দশমণে' বোঝা টেনে আর পারিনে,—নে প্লীজ-করে' ধর্ ভাই!

সামনে আর-একটি মেয়ে পরিবেশন করিতেছিল, পারিজাত পাত্রটা তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

মেয়েটি মুখ ঘুরাইয়া ঠোঁট্ উল্টাইয়া কহিল,—বা রে চাঁদ,—পারবো না। রোজই উনি কাণ্ট-কাণ্ট্ করবেন। ঝোলের থালা রয়েছে হাতে, দেখচো না?

—মাপ্ কর্ ভাই, ঘাট হয়েছে।

দড়াম্ করিয়া বড় পিতলের গামলাটা সে হেলিমনের সামনে বসাইয়া দিল।

পাহাড়ী-মেয়ে হেলিমন্—তাহার দিকে তাকাইয়া একবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

পূর্ণিমা তাহারই পাশে বসিয়াছিল!

পারিজাত কহিল,—ভাই আমাবস্তে! তোমার কিছু লাগবে কি?—বেগ্ ইয়োর পার্ডন্, ভুলে গিয়েছিলাম পূর্ণিমা—আজ-অব্ধি তোমার নামটি আমার মুখস্থ হলোনা,—এক্স্কিউজ্ মি প্লীজ্।

মুহূর্ত্তে আশ-পাশের মেয়েদের মধ্যে হাসির লহর উঠিল।

এম্নি হাসি পূর্ণিমাকে লইয়া সকলেই হাসে—। কিন্তু পূর্ণিমা কোনও কথা কোনো দিন বলিতে পারে না। সেদিনও সে মুখ নীচু করিয়া ভাত মাখিতে লাগিল।

হেলিমন্ তাহার ক্ষুদ্র চক্ষে পারিজাতের দিকে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—বুকে যে বকুল ফুল ফুটে আছে, তারই গন্ধে সব ভুলিয়ে দেয়,—মনে থাকবে কি করে শুনি?

কথাগুলি সে হাসিতে হাসিতেই বলিয়াছিল, কিন্তু পারিজাতের সহ্য হইল না। বাঁ-হাত দিয়া হেলিমনের পিঠে একটি চড় বসাইয়া দিয়া বলিল,—চুপ! শুন্বে—।

—শুহুক্। আমার কি? এত জোরে চড় কসানোটা কি ভাল হল?……একটু টক্ এনে দে তো ভাই, শীগ্গীর্ খেয়ে উঠি।

পারিজাত পাশের মেয়েটির সাম্নে সরিয়া গিয়া কহিল,—যাই।

ভক্তিউষার কাণে কথাগুলি পৌছিয়াছিল। সে কিছু না ভাবিয়াই বলিল,—বকুল-দি'র প্রেমে পড়েছিস্ নাকি ভাই? ইস্কুলের মেয়েদের প্রেমে পড়তে ত' বেশি সময় লাগে না! একবার চোখ চাইলেই হল।

বকুল ম্যাট্রিক্-ক্লাশে পড়ে, মাস-তিনেক্ হইল আসিয়াছে। কে তাহাকে কতখানি ভালবাসে অথবা

বাসে না, তাহার খবরও সে রাখে না; তবে পারিজাতের হাবভাবে তাহার মনে আজ দিনকতক্ হইল খট্‌কা বাধিয়াছিল।

আজ খোলা-খুলি সব শুনিয়া বকুল তাহার চশ্‌মা-পরা অর্দ্ধনিমিলিত স্বপ্নময় চোখদুটি দিয়া পারিজাতের দিকে একবার তাকাইল।

পারুল চীৎকার করিয়া উঠিল,—বকুলে-পারিজাতে, পারিজাতে-বকুলে। খেয়ে উঠে কাটাকুটি করে' দেখতে হবে।—হ্যাঁ ভাই, অনেকটা মিলে যাবে,—কি বলিস?

মেয়েরা কেউ আস্তে, কেউ জোরে হাসিল।

পারিজাত ভাতের গামলা তুলিয়া লইয়া মুখরাঙ্গা করিয়া উঠিয়া গেল।

খানিক্ পরে আর-একটি মেয়ে আসিয়া অম্বল পরিবেশন করিল।

হেঁলিমন্ চুপি-চুপি বলিল,—পারি আজ চটেছে।

মেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ বকুলের ফিটফাট্ মুখখানির পানে তাকাইতে লাগিল।

•

আহারের শেষে মেয়েদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব আর যেন সহ্য হয় না। কে কাহার আগে দৌড়াইয়া লাফাইয়া কলঘরে ঢুকিবে তাহাই ভাবে।

প্রতিদিনের মত সুখলতা দৌড়াইয়া যাইতেছিল, তাহারই অসাবধানতায় ধাক্কা খাইয়া পূর্ণিমা আর-একটি মেয়ের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

—আহা-হা পড়ে গেল? পড়ে গেলে, বেচারী!

সকলের সমবেদনার মধ্য হইতে একটি মেয়ে তাহার সরু গলার মিহিস্বরে বলিয়া উঠিল,—পায়ে বাতের দোষ আছে নাকি? শুকনো মাটিতে আছাড়!

যে মেয়েটির গায়ের উপর পূর্ণিমা পড়িয়া গিয়াছিল সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কপাল কুঁচ্‌কাইয়া চোখ দুইটি অসম্ভব-রকম বড় করিয়া রাগতভাবে কহিল,—এঁ্যা, এঁ্যা! কেমন মেয়ে তুমি! মানুষ দেখতে পাও না?

পারুল বলিল,—মাটির পানে চেয়ে কি উনি চলেন কখনও? কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চলাই ওঁর অভ্যেস। সেদিন ত' আর-একটু হলেই আমাকে এম্‌নি—

কথা শেষ হইল না, পূর্ণিমা সেখান হইতে চলিয়া গেল। কাহারও কথায় প্রতিবাদ করিবার মত সাহস তাহার ছিল না।

কাপড়ে দাগ লাগিয়াছিল, পূর্ণিমা সাবান দিয়া তাহাই তখন ধুইতেছে। হেলিমন কলঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

—একি পূর্ণিমা, কাপড়ে সাবান?

—পড়ে গিয়েছিলাম, কাদা লেগেছে।—মুখে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া পূর্ণিমা কেবল এই কথাই কহিল।

লাগেনি ত' কোথাও?—লেগেছে বৈকি! কি করে' পড়ে গেলি ভাই?

পারিজাত আসিতেছিল সাবানের বাক্স হাতে লইয়া। কলঘরে পূর্ণিমাকে দেখিয়া সে তাহার হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল,—মাগো, দুবেলা দেখছি সাবান মাখা চলেছে; বলি ব্যাপার কি? তাই গায়ের রঙও যে দেখি একটু জেল্লা ধরেছে! আমাদের ত' ভাই পোড়া সাবান মেখেও গায়ের রঙ একচুল এদিক-ওদিক করতে পারি না।

পূর্ণিমার চোখ দুইটা ছলছল করিয়া উঠিল। তেমনি নীরবে সে নতমুখে কাপড়ে সাবান লাগাইতে লাগিল।

হেলিমন জবাব দিল।—এই রঙেই বকুল মজেছে, আর কি চাস্ বল্? যা যা শীগ্‌গীর যা, বকুল যে একা গাছতলায় ঝরে পড়বার মত হল।

—দেখ হেলি, তোমায় আমি কিছু বলছিনা, সব সময় ভাল লাগে না,—যাও!

পারিজাত অন্য বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিল।

ড্রেসিং-রুমের পাশেই বড় ঘরটিতে মেয়েদের হল্লা বড় কম হইতেছিল না। বাদলার দুপুর। ছুটির দিন। ঘরের চীৎকার, আর স্কুলের পাশে বড় ডোবাটায় ব্যাঙের ডাক—সমান তালেই চলিয়াছিল।

একটি বড় টেবিলের চারপাশে বেঞ্চি ফেলিয়া বড় মেয়েরা গল্প করিতেছিল, অদূরে মাটিতে বসিয়া ছোট মেয়েরা ঘুঁটি-খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আজকের দিনে তাহারা প্রাণ ভরিয়া আমোদ করিবে,—পড়ার তাড়া নাই, কাজের ব্যস্ততা নাই; আছে কেবল হাসি-খেলা, গল্প আর গান।

বৃষ্টির ছাঁটে ঘরে জল আসিতেছিল, পারিজাত উঠিয়া জান্‌লাগুলি বন্ধ করিয়া বলিল,—ভাই তারু, লাইটটা জেলে দে। উঃ! কী ভীষণ অন্ধকার হয়ে আসছে ভাই, আজ খিচুড়ীর বন্দোবস্ত হলে মন্দ হতো না,—কি বলিস সতী?

সতী অন্যমনে কি যেন ভাবিতেছিল, কোন কথাই তাহার কাণে গেল না। হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—এতগুলো ইস্কুল চেখে বেড়ালুম, পূর্ণিমার মত এমন একটি চেহারা চোখে পড়েছে বলে' মনে হয় না। কি বলিস পারি? দেখেছিস তুই?

অতিকায় ফর্সা মেয়েটা ব্লাউজের বোতাম আঁটিতেছিল, বলিল,—বাপস্! অমন সিড়িঙ্গে চেহারা, যেন কালো পেত্নী,—অমনধারা নজরে আর ছুটি পড়ে না। কে ভাই সাধ করে' নাম রেখেছিল পূর্ণিমা?

সতী বলিল,—সত্যি ভাই! অন্ধকারে সেদিন ছাতের সিঁড়িতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কালো একটা কি যেন নেমে আসছে দেখে, জোরে চেঁচাব ভাবছি, এমন সময় পিছনে গলার শব্দ পেলাম, বুঝলাম, ভূত-টুত নয়,—মানুষ।

সকলে হাসিল।

পারিজাত বলিল,—শুনেছিলাম মা নেই, সৎমা আছে। ভারি গরীব। কোনরকমে কষ্টে-সৃষ্টে খরচ চালায়। কালো মেয়ের বিয়েও তো হবে না ভাই!

পারিজাত পূর্ণিমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া একটু শিহরিয়া উঠিল।

সতী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল।

পারুল এতক্ষণ তাহার চাবির গোছাটিকে আঙ্গুলের মাথায় ঘোরাইতেছিল, এইবার চাবিগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল,—আমাদের সঙ্গে পেরে উঠতে বাছাধনের ঢে—র দেরী। একটা কথার জবাব ফিরে দিতে পারে? বল্? ভয়েতে মুখে রা' নেই। মনে নেই পারি? সেই যে সেদিন বাদাম গাছ-তলায় কি বলেছিলি, হুঁ-হাঁ কিছু করতে পেরেছিল? ফিরে তাকিয়ে দেখি চোখ ছল ছল করছে।—পারির বাহাদুরী আছে, কি বলিস ভাই?

পারুলের সার্টিফিকেট পাইয়া পারিজাত বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময় ওপরের দোতলার ঘরে হেলিমন ও পূর্ণিমা বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। বাহিরে জোর বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিজলী চম্‌কাইতেছে। এ বৃষ্টির যেন শেষ নাই। চারিদিক অন্ধকার। ঘরের জান্‌লা খোলা, কেবল যে দিকটায় বৃষ্টি খুব বেশী আসিতেছিল তাহাই বন্ধ করা হইয়াছে। এই জোলো-হাওয়া হেলিমনের বড় ভাল লাগে।

—আমার এমনিধারা বাদলার দিন বড় ভাল লাগে

ভাই, কেবল শুয়ে-বসে' গল্প করে কাটাতে ইচ্ছে যায়। তোর কেমন লাগে রে ?

—হুঁ, বেশ লাগে—। বলিয়া পূর্ণিমা আর একবার বাহিরের দিকে তাকাইল।

এম্‌নি একথা-সেকথার গল্প চলিতেছে, হঠাৎ হেলিমন জিজ্ঞাসা করিল,—মুখে হাসি নেই, মন খুলে কথা বলছিস্ না, কি হলো বল্ দেখি ? শরীর কি ভাল লাগছে না ? জানালাটা বন্ধ করে' দি।

পূর্ণিমা তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল,—কিছু হয়নি তো ! এম্‌নি ভাবছি বসে বসে।

—কার কথা রে, কার কথা ? বল্ পূর্ণিমা শীগ গীর বল্। তোকেও কি আবার রোগে ধরলো নাকি ?

—ধ্যেৎ, তুমি কি পাগল হলে হেলিদি ? কার কথা আবার ভাববো !

হেলিমন বলিল,—ক'দিন ধরেই তোকে আন্‌মনা দেখছি, বল্‌না ভাই কেন এমন লাগে, এখানে আর ভাল লাগছে না,—না ?

পূর্ণিমা মুখে কোন কথা বলিল না, তাহার শীর্ণ হাতখানি দিয়া হেলিমনের ছোট হাতখানি নিজের হাতের মুধ্যে তুলিয়া লইল।

হঠাৎ একটা বজ্র পতনের ভীষণশব্দে, কোণে যে মেয়েটি আগাগোড়া 'বেড্‌কভার' গায়ে জড়াইয়া ঘুমাইতে-ছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

—উঃ কী ভয়ঙ্কর, হেলি তোমরা কচ্ছো কি, জান্‌লা খুলে বসে আছ ? বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে দাও।

জানালা বন্ধ হইল; গল্প-গাছাও আর চলিল না, কিন্তু তাহারা দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া হাতে হাত দিয়া পাশাপাশি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি পড়ে, আর বিদ্যুৎ চমকায়।

হেলিমন তাহার হাতখানি মুঠার মধ্যে জোরে চাপিয়া ধরে।

পূর্ণিমার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত শির্ শির্ করিয়া ওঠে।

হেলিমন তাহার ছোট-ছোট চোখ দুইটি তুলিয়া পূর্ণিমার মুখের পানে তাকায়, কিন্তু চোখে চোখ পড়ে না। সে তখন আনন্দে ছলছল চোখ দুইটি তাহার নীচের দিকে নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

পারিজাতের গলার আওয়াজ শোনা যায়,—মুখে তাহার পিয়ানোর গৎ বাজে—

ডো, রে, মি, ফা, সো লা, টি, ডো—

শুক্রবারে ফোর্থপিরিয়েডে ড্রইং ক্লাস। টিচারের আসিতে বিলম্ব হইতেছে।

পূর্ণিমা বার বার প্রবেশ-পথে তাকায়, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া ঘুরিয়া মরে। ড্রইং-এর খাতার পাতাগুলি অযথাই লইয়া সে নাড়াচাড়া করে, দৃষ্টি আবার পথের পানে ধায়।

মেয়েগুলি ফুর্ত্তি করিতেছিল।

পারুল বোর্ডে গিয়া ক্লাসের মেয়েদের 'এড্‌মায়রারস্'-দের নাম লিখিতেছিল। শেষের বেঞ্চির মেয়েগুলি তাহাকে বাহবা দিতেছে।

সুরজিৎ আসিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত ক্লাসটি নিস্তব্ধ হইল। বাহিরের গরমে তাঁহার সমস্ত পোষাক ভিজিয়া গিয়াছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বার-বার সে মুখ মুছিতে লাগিল।

মাধুরী কহিল,—ফ্যান্‌টা খুলে দে না ভাই !

শান্তি বসিয়া বসিয়াই তাহার লম্বা হাতখানি বাড়াইয়া ফ্যানের সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল।

আড়ালে বসিয়া সকলের অসাক্ষাতে দুইটি কালো চোখের চাহনি কেবলই বোর্ডে আবদ্ধ হইতেছিল।

সুরজিৎ বোর্ডে তখন ছবি আঁকিতেছে। আঁকা শেষ হইলে সে চেয়ারে আসিয়া বসিল। তারপর হাতে-মোড়া খবরের কাগজখানা মুখের উপর খুলিয়া এমনিভাবে সে পড়িতে সুরু করিল যেন পড়া এবং মেয়েদের দিকে না

চাওয়া—দুইই তার একসঙ্গে চলে। কারণ মেয়েদের দিকে চাওয়া তাহার রুচিবিরুদ্ধ।

পূর্ণিমা মন দিয়া আঁকে। পাশের মেয়েটা জোরে একটা ধাক্কা দিয়া চুপি-চুপি বলে,—এই, এই—আমার এই পাশটা একটু এঁকে দেনা ভাই!

পূর্ণিমা বিরক্ত হয়, জবাব দেয় না।

—দে ভাই, সুরজিৎবাবু দেখতে পাবেন না, দুজনে খাতা বদল করে নিই।

বাধ্য হইয়া পূর্ণিমাকে দিতে হয়।

মাঝে মাঝে উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া সুরজিৎ সকলের দোষ সংশোধন করিয়া দেয়। পূর্ণিমার বুক কাঁপে, হাত কাঁপে, কিন্তু কোণের বেঞ্চে আসিবার আগেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, সুরজিৎ খবরের কাগজটি মুড়িয়া লইয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া যায়, সিঁড়িতে জুতার শব্দ হয়।

মেয়েরা নিজেদের জায়গা ছাড়িয়া এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে।

মাধুরী বলে,—সুরজিৎবাবুকে ধুতি-চাদরে কখনো দেখিনি ভাই, কোট-প্যান্টে কিন্তু মানায় বেশ।

পারুল মুখ ভ্যাংচাইয়া বলে,—বড্ড বাবু। কেবলই মুখ পোছা। সুন্দর বলে' ভারী অহঙ্কার—কেমন না রে মলি?

পূর্ণিমা জানালা দিয়া দূরের গাছপালার দিকে চাহিয়া থাকে। শুনিতে পায় সবই……

বিকালে আহারের পর দোতলার সিঁড়িপথে হেলিমনের সঙ্গে দেখা, পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—ও কার দুধ-সাগু নিয়ে যাচ্ছ হেলিদি?

—পারিজাতের জর হয়েছে। আয়। বেচারী একা-একা চেঁচাচ্ছে।

সিকরুমে প্রবেশ করিতে যাইবে, পিছনে মনমোহিনীদি হাঁকিলেন,—এই! কে তুমি?—পূর্ণিমা? তুমি ও-ঘরে যাচ্ছ কেন? সিকরুমে কেউ ঢুকবে না, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জান না?

—মিস্ মনমোহিনী মিত্রের কাঁধ দুইটি বারকয়েক নড়িয়া উঠিল। কথা কহিতে গেলেই নড়ে।

হেলিমন একাই পারিজাতের কাছে গেল। পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মনমোহিনী পুনরায় তাঁহার বিপুল দেহভার লইয়া পূর্ণিমার সামনে আসিয়া কহিলেন,—পূর্ণিমা, এ-মাসের পনোরো তারিখ হয়ে গেল, তোমার টাকা আসেনি, বাবাকে চিটি লেখ, চিটি লেখ। মেয়েকে ইস্কুলে রেখেছেন সময়-মত টাকা দিতে পারেন না?—আবার বার কয়েক্ কাঁধ দুইটি তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল।

পূর্ণিমার ম্লান মুখখানি হঠাৎ যেন আরও ম্লান হইয়া গেল। সে জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিতে সাহস পাইল না। পরে মিস্ মিত্র একটু সরিয়া যাইতেই সে নীচে নামিয়া গেল।

রং কালো, দেহ প্রকাণ্ড, মুখগহ্বরে স্থানাভাবে সামনের দাঁতগুলি এলোমেলো ভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, মাথায় চুলের বিশেষ কোন বালাই নাই। দামী ব্লাউজ, রঙ্গীন সাড়ী, সোনার ব্রোচ্ আঁটিয়া মনমোহিনী ঘরের বড় আয়নার সামনে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানান্ ভঙ্গীতে নিজের চেহারা দেখেন, ভাবেন—বড় সুন্দরী, অথবা ঐ রকম একটা কিছু। দূরে অলক্ষ্যে মেয়েরা হাসে, ঠাট্টা করে, কথা বলার ভঙ্গী অনুকরণ করিতে যায়।

পূর্ণিমা ভাবে, সে কি এর চেয়েও—

ভাবনায় বাধা পড়ে।

হেলিমন হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলে,—কি যে ভাবিস্, চল্ ছাতে ঘুরে আসি।

পারিজাতকে পথ্য খাওয়াইয়া হেলিমন নীচে নামিয়া আসিল। পূর্ণিমা সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করিতেছিল।

—বাঃ রে, তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস পূর্ণিমা? আয়।

হেলিমনের সঙ্গে পূর্ণিমা চলিল।

—পারির মাথা খারাপ হয়েছে। জ্বরের ঘোরে পাগলামী যেন আরও বেড়ে গেছে। যতক্ষণ ছিলাম, কেবলই বকুলদি, বকুলদি। দুধ-সাগু কিছুতেই খেল না।

পূর্ণিমা হাসিল।

হেলিমন বলিল,—দেখি আবার বকুলরাণী কি কচ্ছেন, যাই একবার তাঁর কাছে।

এদিক-ওদিক-সেদিক খুঁজিয়া ড্রেসিং-রুমের আয়নার সামনে বকুলের সন্ধান মিলিল। পরিপাটি করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া সে তখন মুখে হেজেলিন্ স্নো ঘষিতেছিল। চোখের চশমাটা খুলিয়া রাখাতে, চোখ দুইটি তাহার অস্বাভাবিক ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে।

—বকুল, ও বকুল!

হেলিমন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তোমার এখনও কাপড় পরা হয়নি? একবার সিক্‌রুমে যেতে হবে যে, পারিজাত তোমায় দেখবার জন্যে.........

কথা শেষ না করিয়াই হেলিমন থামিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। পূর্ণিমা পাশেই ছিল, সে কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে সাহস পাইল না।

চশমাটা কাপড়ের আঁচলে পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া লইয়া চোখে দিতে দিতে বকুল জিজ্ঞাসা করিল,—কেন? তার কী হয়েছে?

চোখ দুইটি তাহার আনন্দে জল্ জল্ করিতেছিল।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেলিমন কহিল,—বে—শ তুমি, পারির যে আজ তিনদিন খুব ডেঙ্গুজ্বর।

—তাই নাকি? আমি তো শুনিনি,—চল। বলিয়া রঙ্গীন সাড়ীর আঁচলটিকে সযত্নে সোনার ব্রোচে আট্‌কাইতে আট্‌কাইতে সিঁড়ি বাহিয়া হেলিমনের সঙ্গে সেও উপরে উঠিতে লাগিল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া পূর্ণিমা কি মনে করিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় সতী ডাকিল,—ওগো বাগ্‌দীপূর্ণিমা, মনমোহিনীদিদি তোমায় যে ডাকছেন!

ধীরে ধীরে পূর্ণিমা অফিস-রুমের দিকে চলিল।

আজকাল প্রতিসপ্তাহেই পূর্ণিমা সমাজে যায়, আজও গেল।

মিসেস্ পাত্র আজ সঙ্গে যাইবেন। প্রকাণ্ড 'বাস্'টি মেয়েতে প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে, মিসেস পাত্র উঠিয়া দরজার পাশেই বসিলেন। তিনি যথাসম্ভব নিজের পোষাক পরিচ্ছদ বাঁচাইয়া, জানালার ফাঁকে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়া সরুগলায় বলিলেন,—দরোয়ান, দেখোতো আওর কোন্ রাবালোক্ হ্যয় কি নেই?

তারু কোণ ঠেসিয়া বসিয়াছিল, পারুলের হাতে একটু চাপ দিয়া কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—দেখছিস্ ভাই? পাত্র-মশাই কেমন আল-গোছে বসেছেন, পারেন তো হাওয়ায় উড়ে যান।

পারুল তাহার দুই ঠোঁটের মধ্যস্থলে আঙ্গুল চাপা দিয়া চোখ দুটি বাঁকা ভাবে ঘুরাইয়া বলিল,—চুপ্!

পূর্ণিমা গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিরক্ত-ভাবে মিসেস্ পাত্র বলিলেন,—কি হচ্ছিল তোমার, এত দেরী হয়ে গেল, উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেছে, একটা আক্কেল নেই?

পূর্ণিমা অপরাধীর মত গাড়ীতে উঠিল। হেলিমন আজ আগেই আসিয়াছিল। গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

মেয়েদের কাপড়ের নোংরা ধূলা সাড়ীতে লাগিল

ভাবিয়া মিসেস পাত্র বার-বার তাচ্ছিল্য ভরে দুই হাতে তাঁহার হাঁটুর কাপড় ঝাড়িতে লাগিলেন। মেয়েরা তখন জানালা দিয়া পথের দৃশ্য দেখিতেছে।

সমাজগৃহ নিস্তব্ধ। বৃদ্ধ চন্দ্রশেখরবাবু বেদীর উপর বসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

মিসেস্ পাত্রর পিছু পিছু গিয়া, কাছাকাছি চেয়ারে সকলে বসিয়া চোখ বন্ধ করিল।

পূর্ণিমার চোখ বুজিতে ভাল লাগে না, আড়ালে বসিয়া চাহিয়া থাকে, মন অন্যদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, উপাসনা কাণেও যায় না।

পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, ধীরে ধীরে মোটা গলায় চন্দ্রশেখরবাবু পুনরাবৃত্তি করেন—হে প্রভু, আমাদের অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। হে প্রভু, আমাদের সুন্দর কর, সুন্দর কর......

পূর্ণিমা আশপাশের মেয়েদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে।

উপাসনান্তে গান সমাপ্ত হইবার পর আবার সকলের বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

সেদিন একটু দেরী হইয়াই গেল।

মিসেস্ পাত্র একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলেন, মেয়েরা পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল।

হঠাৎ তারু হেলিমনের আঙ্গুলে মৃদু টান দিয়া বলিল,—হেলিদি ঐ মেয়েটি কে? ঐ যে সুরজিৎ-বাবু কথা বলছেন। মেয়েটি তো ভাই বেশ দেখতে।

একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া হেলিমন কহিল, —ও:, ও যে—সুচন্দ্রিমা! বেথুনে থার্ডইয়ারে পড়ে। একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল,—সুরজিৎবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে তুলেছে দেখছি।

পূর্ণিমা কাছেই ছিল, সে তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল। নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস হাওয়ায় মিশিয়া গেল।

মিসেস পাত্রর ডাকে মেয়েরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, যাইবার শেষ মুহূর্ত্তে পূর্ণিমার দুইটি চোখের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি আবার সুরজিতের দিকে গেল।

তখনও দূরে সুচন্দ্রিমা হাসিতেছে, কথা কহিতেছে।

সুরজিৎও হাসিতেছে.........

সুরজিৎ স্কুলে আসে, কাজ করে, চলিয়া যায়। পূর্ণিমা দেখে, ভাবে আর ব্যথা পায়। অনুক্ষণ ঐ সব চিন্তা তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, হঠাৎ মাঝ পথে তাহার এই চিন্তাস্রোত অন্যপথে গতি হারাইয়া ফেলে। সুচন্দ্রিমার কথা মনে হয়। তাহার কান্না পায়।

আজকাল মেয়েরা ড্রইং ক্লাসে ভারী ফুর্ত্তি করিয়া বেড়ায়।

—আমার এখানটা হচ্ছে না সুরজিৎবাবু, পাচ্ছিনা।

বেবী সেদিন তাহার কাপড়ের আঁচলটাকে মুখে গুঁজিয়া কাৎ হইয়া ডানদিকে হেলিয়া আবদারের সুরে কথাগুলি বলিল।

ঘরের ভিতর সুরজিৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কাছে আসিল, হাসিয়া পুনরায় দেখাইয়া দিল।

—আঁমি আঁজ পারবোনা আঁকতে, এঁত শঁক্ত!

সুলতা যেন ইচ্ছা করিয়াই নাকি সুরে কথাগুলি কহিল।

রেবা পাশেই বসিয়াছিল, জোরে একটা চিমটি কাটিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—আহা, ঢং দেখে আর বাঁচি না।

—উঃ, দেখুন তো, দেখুন তো—

রেবা তাহার থ্যাবড়া হাতে ছোট একটি চড় কসাইয়া কহিল,—ফের্ !

তবু তো পারুল সেদিন আসে নাই !

সুরজিৎ এই সব দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া মুচ্‌কিয়া হাসে। সে গাম্ভীর্য্য এখন আর তাহার নাই, মেয়েদের মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেও বাধে না, অনর্থক খবরের কাগজও খুলিয়া বসে না।

পূর্ণিমা ঘাড় গুঁজিয়া পূর্ব্বের মত একাগ্র-চিত্তে ছবি আঁকিবার ভাণ করে।

দিন-কয়েক্ পরে—

তেতলার ছাতে উঠিবার গোল ঘুরানো সিঁড়িটার বাঁকে ছোট্ট কাঁচের জানালার উপর হেলিমন তাহার ফর্সা খাটো পা-দুখানি ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহারই একটু নীচে সিঁড়ির ধাপে পূর্ণিমা বসিয়া।

—তুই দিন-দিন এমন হচ্ছিস্ কেন বল্‌তো? খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে,—নিশ্চয়ই তোর মনে কিছু হয়েছে......আমায় লুকোচ্ছিস্—

পূর্ণিমা মাথা নীচু করিয়া রহিল, চাপা কান্নায় তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না।

—আজ কদিন ধরে সাধছি, তবু বল্‌বি না। মাঝে শরীরটা তোর কেমন সেরে উঠেছিল !—এমনি করলে বাঁচবি কি করে ?

হেলিমন একাই কথা বলে, পূর্ণিমা জবাব দিতে পারে না। দুই চোখ বাহিয়া তাহার অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে পূর্ণিমা কতকটা শান্ত হইল। একটু থামিয়া ব্যথাভরা সলজ্জ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—সুরজিৎ-বাবু এখন কোথায় আছে হেলিদি, তুমি জান ?

হেলিমন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—কেন ? তুই জানিস না ? তিনি তো সুচন্দ্রিমাকে বিয়ে করে গত শনিবার চাকরী নিয়ে লাহোরে গেছেন।

পূর্ণিমার মাথাটা হেলিমনের কোলে হেলিয়া পড়িল।

দুই জনে কথা হয়। আবার চুপ হইয়া যায়।

হেলিমন বলে,—কই, এতদিন তো তুই আমাকে কিছু বলিস নি ? গোপন করিছিস কেবল।

—লজ্জা করতো হেলিদি।

হেলিমন আর কোনও অনুযোগ করে না, ধীরে ধীরে পূর্ণিমার রুক্ষ কালো চুলের গোছাগুলি শীর্ণ কপালের উপর হইতে সরাইয়া দেয়।

একটু পরে ব্লাউজের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পূর্ণিমা হেলিমনের হাতে দিল।

—বাবার চিঠি আজ এসেছে, পড়ে দেখ।

তাড়াতাড়ি খোলা খামের মধ্য হইতে চিঠিখানা হেলিমন টানিয়া বাহির করিল, পরে সাগ্রহে মনে মনে পড়িতে লাগিল।

চিঠি পড়া শেষ হইলে ধীরে ধীরে মুড়িয়া পুনরায় সেটি পূর্ণিমার হাতে দিয়া হেলিমন বিস্মিত হইয়া কহিল,—একি! হঠাৎ যাবার তাড়া যে! তুই কি যাবার কথা লিখেছিলি ভাই ?

পূর্ণিমার চোখ দুইটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল,—আমি তো কিছু লিখিনি হেলিদি।

—এত হঠাৎ, একেবারে পর্শু ?

হেলিমন থামিয়া গেল। বেশি কথা সে আর বলিতে পারিল না।

দুটি দিন কাটিতে খুব বেশি দেরী হইল না।

সেদিন দুপুরে আবার তেমনি গরম। বাহিরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময় খুব লম্বা রোগা অত্যন্ত কালো একটি লোক নীল পর্দ্দা ঠেলিয়া অফিসরুমে প্রবেশ করিল। পরনে তাহার খাটো মোটা কাপড়, গায়ে পুরাণো কালো কোট, পায়ে সাদা ক্যান্‌ভাসের ধূলামলিন জুতা, চোখে নিকেলের পুরু কাঁচের চশমা।

মিস্ মিত্র একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার বড় চোখ দুইটি কুঁচ্‌কাইয়া ছোট হইয়া আসিল, কলম হাতে করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি চান?

আগন্তুক হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল,—আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমি, বুঝেছেন?—আমার মেয়ে পূর্ণিমাকে নিতে এসেছি।

—ওঃ আপনি? বসুন। অদূরে একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া মিস্ মিত্র জোরগলায় হাঁকিলেন,—দরোয়ান, দরোয়ান! বাবা কো খবর দেও! পূর্ণিমা বাবাকো।

মিস্ মিত্র পুনরায় কাজে মন দিলেন।

হ্যাঁ, এই দেখুন, এই যে,—বাকী টাকাটা, বুঝে' নিন্, বুঝেছেন? আর আমার মেয়ের নামটা কেটে দেবেন।—বুঝেছেন?

মিস্ মনমোহিনী মিত্র অদূরে বুড়া কেরানীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—ঐ-খানে দিন।—তারকবাবু এঁর টাকাটা নিন্‌তো।

গাড়ী আসিল, সব জিনিষ একে একে গাড়ীতে উঠিল, পূর্ণিমার দেরী হইতেছিল।

হেলিমনের চোখ ছল ছল করিতেছে—পূর্ণিমা কাঁদিতেছে।

পারুল সামনে আসিয়া কহিল,—হেলিদি, পূর্ণিমা কি শ্বশুরবাড়ী চলেছে নাকি?

তাহার কথার জবাব কেহ দিল না। হাতে হাত দিয়া দুইজনে মাঠের পথে চলিল, কাহারও মুখে তখন কথা সরিতেছিল না। শেষপ্রান্তে আসিয়া পূর্ণিমা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—হেলিদি, চল্লুম।

—চিঠি লিখিস্ ভাই...

...চেরাপুঞ্জীর এই পাহাড়ী মেয়েটির চোখে, সেদিন অপরাহ্নের এই বিদায়-বেলায় অঝোরে অশ্রুর বর্ষা নামিল।

আন্তন শেহভ

স্মৃতি-কথা

ম্যাক্সিম গোর্কি

আজ লইয়া এই পাঁচ দিন হইল,—এম্‌নি প্রবল জ্বর আসিতেছে; কিন্তু বিছানায় পড়িয়া থাকিতে আর পারি না। বাহিরে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ধূসর বাদল চারিদিকে সিক্ত ধূলি-কণা ছিটাইয়া ফিরিতেছে। ইন্নো-কেল্লার কামানগুলি হইতে বজ্র-গম্ভীর শব্দ শোনা যায়,—সেগুলি ঠিক অবস্থায় আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা চলিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে 'সার্চ্চ-লাইটের' সুদীর্ঘ জিহ্বা দূর-আকাশের মেঘগুলি লেহন করিতেছে। দেখিলেই বিরক্তি লাগে। মানুষকে তার ঐ বীভৎস ব্যাধি……যুদ্ধ-হানাহানির কথা কিছুতেই উহা ভুলিয়া থাকিতে দেয় না।

শেহভের বই পড়ি। দশ বৎসর আগে যদি তাঁহার মৃত্যু না ঘটিত তাহা হইলে বোধকরি এবারকার এই যুদ্ধ মানবজাতির প্রতি তীব্র ঘৃণার বিষে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া অবশেষে শেষ করিয়া দিত। আজ তাঁহার শবানুগমনের কথা মনে পড়ে।

মস্কোর অত 'আদরের লেখকটির' শবাধার একখানি সবুজ রেলওয়ে-ভ্যানে শহরে আসিয়া পৌঁছিল,—দরজায় তার বড় বড় হরফে লেখা—'For Oysters' …..মাছের গাড়ী। উহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য ষ্টেশনের উপর যে ক্ষুদ্র জনতা জমিয়াছিল, তাহারই মধ্যে কয়েকজন আবার মাঞ্চুরিয়া হইতে আনীত জেনারেল কেল্লারের শবাধারের পিছু পিছু চলিল, ·····শেহভের শব-যাত্রায় সামরিক বাদ্য শুনিয়া তাহারা ত একেবারে অবাক!—অবশেষে ভুল যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন জনকয়েক দিল্-খোলা লোক 'হো হো' হাসি সুরু করিয়া দিল। শেহভের শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলিল প্রায় শ' থানেক লোক, তার বেশী নয়। দুইজন উকীলকে আমার মনে পড়ে, দুজনেরই পায়ে নূতন বুট, গলায় বাহারে টাই, যেন বিবাহের বর! তাহাদের পিছু পিছু আমি চলিয়াছিলাম। কাজেই শুনিতে পাইলাম, একজন—ভি, এ, ম্যাক্‌লাকভ্—কুকুরের বুদ্ধি-বৃত্তির কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আর একজন (ইনি আমার অপরিচিত) তাঁর পল্লী-ভবনের সুখ-সুবিধার কথা, তার আশ-পাশের সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির কথা লইয়া গদ-গদ হইয়া উঠিয়াছেন। আর একটি মহিলা লাইলাক্ রঙের ছাতার ছায়ায় চলিতে চলিতে 'টরটয়েজ শেলে'র চশমা-পরা এক বৃদ্ধকে কেবলই বুঝাইতেছেন—

"আহা লোকটি চমৎকার ছিল……এমনটি আর হয় না! কত হাসাতো……"

বৃদ্ধ কিন্তু অবিশ্বাসভরে কাশিতে থাকেন।

দিনটাও আবার তেম্‌নি গরম,—ধূলাও খুব।

সকলের আগে আগে মোটা সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বেশ ভারী চালে মিছিলের কর্ত্তা হইয়া চলিয়াছেন পুলিসের মোটা ইনস্পেক্টর।

……কিন্তু সেই অনুপম রূপদক্ষের শবানুগমনের দিনে এমনি-ধারা সব ব্যাপার একান্ত কুৎসিৎ, নিতান্ত হৃদয়হীন এবং অত্যন্ত অশোভন।

প্রবীণ সুওভোরিন্‌কে শেহভ তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "সংসারে টিঁকে থাকবার জন্য দিনের পর দিন মানুষের যে এই একটানা সংগ্রাম, জীবনের আনন্দ শুষে নিয়ে জড়তার চরম সীমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে যেতে, এর মত নীরস ও বিরক্তিকর ব্যাপার দুনিয়ায় আর কিছু নেই।"

এই কথাগুলির মধ্যে রুষ-মানসের যে পরিচয় ফুটিয়া ওঠে, সব দিক্ দিয়া বিচার করিলে, আমার মনে হয়, শেহভের বিশিষ্টতার সত্যকার পরিচয় তা নয়। রাশিয়ায়—যেখানে কর্ম্ম-প্রিয়তা ছাড়া অপর সব জিনিষই লোকেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানকার বেশীর ভাগ লোকই এই ভাবে ভাবিয়া থাকে। তাহারা কর্ম্ম-শক্তির তারিফ করে, বাহবা দেয়, কিন্তু ইহার উপর আস্থা তাহাদের অতি কম। জ্যাক্ লণ্ডনের মত কর্ম্ম-প্রবণ সাহিত্যিক রাশিয়ায় পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার বই রাশিয়ার লোক উৎসাহের সঙ্গে পড়ে, কিন্তু তার ফলে যে রুষের চেতনা কর্ম্মের বিরাট ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিতে পারিল, এমন ধারা কোনও লক্ষণ ত আমি কোথাও দেখি না। এ শ্রেণীর সাহিত্য রুষ-বাসীর কল্পনাকে খানিকটা দোলা দিয়া নাচাইয়া দিয়া যায় মাত্র। এ দিক্ দিয়া শেহভ সাধারণ রুষ-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যৌবনের প্রারম্ভেই মানুষের এই জীবন-সংগ্রাম সামান্য রুটি-মাখমের প্রতিদিনকার অতিতুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অব-

মাননার ভিতর দিয়া তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হয়। কেমন করিয়া আরও বেশী রুটি আরও বেশী মাখম মিলিবে তাহারই ভাবনায় সবাই আকুল! সর্ব্বপ্রকার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকেও যৌবনের সমগ্র শক্তি এই দুশ্চিন্তার কবলে সঁপিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা এই যে তাহা সত্ত্বেও চিত্তের সরসতা তাঁহার একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জীবনকে তখন তিনি দেখিয়াছিলেন,—এ যেন শুধু তৃপ্তি ও বিশ্রাম লাভের জন্য মানুষের একটানা অস্থির প্রয়াস! জীবনের বৃহৎ বিচিত্র নাট্য, গভীর করুণ কাহিনী সুলভ বিশেষত্বহীনতার কঠিন পুরু আবরণের নীচে তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আশ-পাশের মানুষের পর্য্যাপ্ত আহার কেমন করিয়া মেলে, এই দুর্ভাবনা হইতে নিজেকে যখন তিনি একটু মুক্ত করিয়া লইলেন, তখনই তাঁহার ঐ ঈগলের মত অব্যর্থ দৃষ্টি এই সব বিচিত্র নাট্যের মূলে গিয়া পৌছিল।

কর্ম্মকে 'কাল্‌চারে'র ভিত্তি করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা এত গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুভব করিতে শেহভের মত আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার সাংসারিক ব্যবস্থার সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্যে, যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নির্ব্বাচনে, এবং সেগুলির প্রতি তাঁহার একান্ত মমতায় এই অনুভূতি বারে বারে আপনাকে প্রকাশ করিত। সেই গভীর মমতাবোধ, সঞ্চয়ের বাসনা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া, এই সব দ্রব্য-সামগ্রীকে মানব-মনের সৃজনী-শক্তির বিচিত্র দানরূপে গ্রহণ করিয়া সমাদর করিতে কোনও দিন ক্লান্তি বোধ করিত না। কোনও কিছু গড়িতে, উদ্যান রচিতে, পৃথিবীকে সুন্দরী করিয়া সাজাইতে তিনি ভাল বাসিতেন। কাজের মধ্যে কাব্যের মাধুরী তিনি অনুভব করিতেন। নিজের বাগানে যে সব ফুলের গাছ পুতিয়াছিলেন সেগুলির পানে কি স্নিগ্ধ, মর্ম্মস্পর্শী যত্নেই না তাকাইতেন! আউট্‌কায় যখন নিজের গৃহরচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন বলিতেন—

"নিজের জমিতে যদি প্রত্যেকে যতটা যা পারে তাই করে তা'হলে আমাদের এই পৃথিবী কত সুন্দর হয়!"

সে সময় আমি Vaska Buslayev (একটি রাশিয়ান পৌরাণিক চরিত্র) নামে একখানি নাটক রচনার কথা ভাবিতেছিলাম। শেহভের কাছে ভাস্কার দম্ভপূর্ণ স্বগতোক্তিটুকু পড়িতে লাগিলাম।

"হায়, হায়, আমার যদি শক্তি থাকতো—প্রচুর পরিমাণে, তা'হলে উষ্ণ নিঃশ্বাসে—তুহিন গলিয়ে দিতাম। ধরিত্রীর দিকে দিকে ছুটে যেতাম-লাঙল কাঁধে নিয়ে। যতদিন বাঁচতাম, কেবলই নগরের পর নগর, গির্জ্জার পর গির্জ্জা, কুঞ্জের পর কুঞ্জ, উদ্যানের পর উদ্যান রচনা করে ঘুরে বেড়াতাম! বসুন্ধরাকে একটি তরুণীর সাজে সাজিয়ে তুলতাম, প্রিয়া বলে কাছে টেনে নিতাম, বুকে তুলে ধরতাম, উর্দ্ধে ভগবানের কাছে নিয়ে গিয়ে বলতাম, প্রভু, প্রভু, দেখ দেখ, কি সুন্দরী এই পৃথিবী! ভাস্কা তাকে কত অপরূপ করে গড়েছে! তুমি যাকে স্বর্গ থেকে এক খণ্ড পাথরের মত নীচে ফেলে দিয়েছিলে, আমি তাকে চমৎকার মরকত-মণিতে পরিণত করেছি। হে প্রভু, নীচের দিকে একবার চেয়ে দেখ, সূর্য্যের আলোয় ধরার সবুজ রূপ কি অপূর্ব্ব হয়ে ঝলমল করছে দেখ!···দেখে আনন্দ কর। একে তোমায় উপহার দিতাম, কিন্তু তা ত উচিৎ হবে না, এ যে আমার একান্ত আপন!"

এই লেখাটুকু শেহভের পছন্দ হইয়াছিল। উত্তেজনাভরে সামান্য একটু কাশিয়া তিনি ডাক্তার এলেক্সিন এবং আমাকে বলিলেন—

"বেশ!······একেবারে সত্যিকার জিনিষ—মানুষের সমস্ত 'ফিলজফি'র অর্থ ত ওর মধ্যেই। মানুষই এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে, সেই একে আনন্দের আগার করে গড়ে তুলবে।" দৃঢ়তার সহিত একটু মাথা নাড়িয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, 'হাঁ, সেই করবে।'

ভাস্কার ঐ গর্ব্বোক্তি আবার পড়িবার জন্য তিনি আমায় অনুরোধ করিলেন। জানালার বাহিরে তাকাইয়া সবটুকু শুনিয়া বলিলেন—

"শেষের কথাগুলি ওখানে থাকা উচিৎ নয়। ভয়ানক দুঃসাহসের কথা……অনাবশ্যক……"

নিজের লেখা লইয়া তিনি কখনও বেশী কথা বলিতেন না, এবং যখনই বলিতেন তখনই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। লিও টলষ্টয়ের কথা উঠিলে যতটা সসঙ্কোচ গাম্ভীর্য্যে সন্তর্পণে হিসাব করিয়া কথা কহিতেন, নিজের লেখা সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি ভাবে আলাপ করিতেন। অতি কদাচিৎ কোনও এক আনন্দের মুহূর্ত্তে একটু মৃদু হাসিয়া কোনও একখানা গল্পের প্লট বিবৃত করিতেন। সব সময়েই সে-গুলি হাসির হইত।

"জান হে,—আমি একটি স্কুল-মিস্ট্রেস্‌কে নিয়ে গল্প লিখব। সে ভগবান মানে না, ডারউইনের ভারী ভক্ত—তাকেই পূজো করে; মানুষের কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে এতটুকুও দ্বিধা নেই। কিন্তু সে-ই আবার মাঝরাতে তামার পাতে কালো বেড়াল আগুনে সেদ্ধ করতে বসে। ওর ঐ ছোট হাড়, যা দিয়ে পুরুষ মানুষ মেয়েদের বশ হয়, পুরুষের মনে ভালবাসা জাগে, ওইটির প্রতি ওর লোভ।—ও-রকম ছোট হাড় আছে হে · …"

নিজের নাটকের কথা যখন তিনি বলিতেন তখন মনে হইত যেন হাসি তামাসার ব্যাপার বলিয়া চলিয়াছেন। আমার মনে হয় নাটক লিখিবার সময় তিনি যে হাস্যচপল রচনায় হাত দিয়াছেন, একথা নিজের মধ্যে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিতেন। শেহভের নিকট শুনিয়াই বোধ হয় সাভা মোরসভ্ অত জোরের সঙ্গে তর্ক করিত, "শেহভের নাটকের 'লিরিকাল কমেডির' মতই অভিনয় হওয়া উচিৎ।"

কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিচিত্রগতি তিনি খুব মন দিয়া লক্ষ্য করিতেন। সাহিত্যের পথে নূতন যাত্রী যারা তাহাদের তিনি একটু বিশেষ প্রীতির চোখেই দেখিতেন। অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি বি, লাজারেভস্কি, এন্, অলিগার এবং আরও অনেকের লেখার সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি পড়িতেন।

তিনি বলিতেন—"আমাদের আরও অনেক লেখক চাই। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্য কি, তাই অধিকাংশ লোক জানে না। এ তাদের কাছে একেবারে নতুন। খুব অল্প বাছা বাঁছা লোকের মধ্যেই এখন এর প্রচার। নরওয়েতে কিন্তু প্রত্যেক ২২৬ জনে একজন লেখক, আর আমাদের—এক লক্ষর মধ্যে একজন……"

রোগে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মানসিক বিকৃতি ঘটিত; কখনও বা সর্ব্ব-দ্বেষী হইয়া পড়িতেন। সে সময় তাঁর মতামতের মধ্যে খামখেয়ালীপনার পরিচয় থাকিত, লোকের সঙ্গে ভালরকম মেলামেশাও করিতে পারিতেন না।

একদিন কৌচের উপর শুইয়া থার্ম্মোমিটার লইয়া খেলা করিতে করিতে শুক্‌নো কাশি কাশিয়া কহিলেন—

"মরার জন্য বেঁচে থাকায় কোন মজা নেই, আবার অকালেই মরতে হবে একথাও জেনে বেঁচে থাকা,—ভারী বিশ্রী……"

আর এক সময় মুক্ত বাতায়নের পাশে বসিয়া দূরে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া হঠাৎ রাগিয়া বলিয়া ওঠেন—

"চমৎকার আব্-হাওয়া, প্রচুর ফসল, মধুর প্রণয়, অজস্র পয়সা-কড়ি অথবা পুলিশের বড় কর্ত্তার চাকরীটির আশায় দিন গুণে বেঁচে থাকতে আমরা খুব অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু কোথাও দেশের লোককে 'জানব, শিখব, বুঝব'—এই আশা নিয়ে বড় হয়ে উঠতে ত দেখি না। আমরা বলি—নতুন জারের অধীনে আরও ভাল হবে, দুশো বছরের মধ্যে তার চেয়ে আরো ভাল হবে, কিন্তু কেউই একটু কষ্ট স্বীকার করে বলে না, সেই-ভালো কালই সুরু হোক্। মোটের ওপর, জীবন যাত্রা ক্রমে

ক্রমে প্রতিদিন আরো জটিল হয়ে উঠছে, এ যেন কেবল নিজের গতিতেই এলোমেলোভাবে একটা দিকে চলেছে। মানুষের বোকামির মাত্রা দিন দিন আরো স্পষ্ট হয়ে বেড়ে যাচ্ছে; বহু বহুলোক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছে।"

একটু ভাবিয়াই পুনরায় কপাল কুঁচকিয়া বলেন—

"ঠিক যেন চার্চ্চের মিছিলে খোঁড়া ভিখিরীর দল।"

শেহভ ডাক্তার ছিলেন, এবং ডাক্তারের যখন অসুখ হয়, তার অবস্থা সর্ব্বদাই তার রুগীর থেকে গুরুতর হয়। রুগী শুধু অনুভব করে, কিন্তু ডাক্তার জানে কেমন করিয়া তার দেহ-যন্ত্র ধীরে ধীরে বিকল হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য জায়গার মত এখানেও চেতনার ফলে মৃত্যু আসিয়া দেখা দিল।

মুচ্‌কিয়া হাসিবার সময় তাঁর চোখ ছুটি বড় সুন্দর দেখাইত,—ঠিক যেন মেয়েদের চোখ, তেম্‌নি প্রীতিভরা, তেম্‌নি স্নিগ্ধ মমতাময়। আর তাঁর হাসি?—শব্দ হইত না বলিলেই চলে,……ভারী চমৎকার! নিজেই হাসিয়া সেই-হাসি উপভোগ করিতেন, একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন।

আমি অবাক্ হইয়া ভাবি যে এমন সুন্দর সহজ নির্ম্মল হাসি আর কে হাসিতে পারিত!

নোংরা গল্প-কথায় কোনদিন তাঁর হাসি পাইত না।

একদিন অম্‌নি মধুর সাদর হাসি হাসিয়া তিনি আমায় বলিলেন—

"টলষ্টয় তোমার ওপর অত বিরক্ত কেন জান? তাঁর ঈর্ষা হয়; তিনি মনে করেন, সুলারজিট্‌স্কির তোমায় তাঁর থেকেও বেশী ভাল লাগে। হাঁ হে হাঁ! কাল তিনি আমায় বলছিলেন, 'গোর্কিকে আমি কিছুতেই অকপটে নিজের করে গ্রহণ করতে পারি না। কেন জানি না, কিন্তু পারি না। সুলার যে ওর সঙ্গে আছে, তাও আমার ভাল লাগে না। এতে সুলারের কোনও কল্যাণ নেই। গোর্কি ভারী খিট্‌খিটে লোক। ওকে দেখলে মনে হয় যেন জোর করে কোনও একটা থিয়লজির ছাত্রকে ধর্ম্ম-যাজক করা হয়েছে, তাই কোনও কিছুরই ভাল ও দেখতে পায় না। ভারী সন্দিগ্ধ মন ওর,—ঠিক যেন একটা 'স্পাই'। কোত্থেকে যেন ও ক্যানানের দেশে চলে এসেছে। এখানকার সবই ওর অপরিচিত। তাই ও প্রত্যেক জিনিষ লক্ষ্য করে, পরীক্ষা করে এবং তারপর ওর কোন্ দেবতার কাছে জানায়। ওর ভগবান এক বিকটাকার দেবতা, কতকটা চাষীর মেয়েদের বনদানব অথবা জলদানবের মত।"

এই কথা শেহভ যখন বলিতেছিলেন, তখন চোখে জল আসা না পর্য্যন্ত তাঁর মুখে হাসিই ছিল; অবশেষে চোখ মুছিয়া লইয়া তিনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

"আমি বললাম, 'গোর্কি ভাল লোক।' কিন্তু তিনি তাঁর জেদ বজায় রাখলেন, 'না, না, আমি জানি। পাতি-হাঁসের মত নাক ওর; কেবল লক্ষ্মীছাড়া খারাপ লোক-দেরই অমন নাক হয়। মেয়েরা ওকে ভালবাসে না। কুকুরের মত মেয়েদের ভাল মানুষের ওপরই টান। সুলার—হাঁ, মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসবার দুর্লভ ক্ষমতা সত্যি সত্যি ওরই আছে। এদিক্ দিয়ে সে একটা প্রতিভা! কেমন করে ভাল বাসতে হয় তা যে জানে সে সব জানে'……"

আবার একটু থামিয়া শেহভ বলিলেন—

"হাঁ, সত্যি, বুড়ার ঈর্ষা হয়।…কি আশ্চর্য্য লোক!"

টলষ্টয় সম্বন্ধে যখন তিনি কিছু বলিতেন তখন সর্ব্বদাই তাঁর চোখে করুণ উৎকণ্ঠার অস্পষ্ট অদ্ভুত মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিত। গলার স্বরও উঁচুতে উঠিত না—যেন কোন্ এক স্বপ্নময় রহস্যের কাহিনী বলিয়া চলিয়াছেন, সতর্কতার সঙ্গে কোমল শব্দচয়ন যেন তার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

কতবার তিনি অনুযোগ করিয়াছেন যে ঐ বৃদ্ধ যাদুকরের তীব্র উল্টাপাল্টা ভাবগুলি ভাল করিয়া যত্নের সঙ্গে

লিখিয়া লইতে পারে এমন কোন একারম্যান টলষ্টয়ের কাছে নাই।

সুলারজিট্স্কিকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন :—"তোমারই এটা করা উচিৎ। টলষ্টয় তোমায় কত ভাল বাসেন, তোমার সঙ্গে কত কথা বলেন, আর তাও কত সুন্দর করে—"

সুলারজিট্স্কি সম্বন্ধে শেহভ আমায় বলিতেন,—"ও একটি প্রবীণ শিশু।"

কথাটি ভারী চমৎকার!

টলষ্টয় একদিন আমার সামনে শেহভের একটি গল্প লইয়া খুব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় সে 'দি ডার্লিং' গল্পটি লইয়া তিনি বলিলেনঃ—

"এটি যেন একখণ্ড লেস্—কোনও এক নিষ্পাপ কুমারী এটি তৈরী করেছে। আগেকার দিনে এম্নি মেয়ে ছিল। সারা জীবন লেস্ বুনে চলাই তাদের কাজ ছিল। ঐ নক্সার মধ্যে তারা নিজের বলতে যা কিছু...... সমস্ত সুখস্বপ্ন......সব নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। তাদের সব থেকে যা প্রিয় তা ঐ নক্সায় ফুটে ওঠে, তাদের অন্তরের যত কিছু অনাঘ্রাত অনবদ্য অস্পষ্ট ভালবাসা তা ঐ লেসের ওপর আঁকা হয়।" বলিতে বলিতে উত্তেজনায় টলষ্টয়ের চোখে জল আসিল।

সেদিন শেহভের খুব জ্বর আসিয়াছিল। গালের উপর লাল লাল কি সব দাগ বাহির হইয়াছে,—তিনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে প্যাস্-নে চশমাটি ঘসিতেছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—

"কতকগুলো ছাপার ভুল রয়ে গেছে ওতে......"

শেহভ সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যায়। কিন্তু তাঁর কথা লিখিতে গেলে খুব সুন্দর করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া লেখা উচিৎ। আমি তাহা পারি না। তিনি যেমন করিয়া তাঁর Steppe গল্পটি লিখিয়াছেন, তেমনি ভাবে তাঁর কথা লিখিতে পারিলে কতই না আনন্দের হয়! অমনি একখানি সুন্দর সুরভিময় সহজ গল্প,......রুষ-জীবনের ব্যথা-কাতর সুরের পরিপূর্ণ প্রকাশ,......একখানি চমৎকার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী!

—অনুবাদক মুরলীধর বসু

পাঁক

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(দ্বিতীয় পর্ব্ব—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেন হবে না? পুণ্যি সবারই হয়। সবাই সগ্‌গে যেতে পারে।

অন্ততঃ পদ্ম তাই বলে।

পদ্ম বলে,—"যাওনা কথকঠাকুরের কাছে শোন না গিয়ে, ওই যে অতবড় দুষমন জগাই মাধাই তারাও সগ্‌গে গেল শেষে; পাপ করলে তার আর কাটান নেই?"

হয়ত কেউ বলে, "তাবলে পটলি!"

পদ্ম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, "কেন পট্‌লি কি ফেল্‌না? আর কি বা করেছে পট্‌লি! ওইত। বিশ বছরের এক ফোঁটা ছুঁড়ি! বলে—"

কিন্তু পদ্ম আর বেশী কিছু বলে না।

হয়ত কণে বৌ বলে, "শুধ্‌ দুবেলা গঙ্গায় চান করে এলেই সগ্‌গ হয় না!' ভাতারের মুখে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে নাতি মেরে আবার গঙ্গা চান।"

ভাতারের মুখে আবার নাতি মারে কে?

"কেন পট্‌লি! স্বচক্ষে আজ যদি বা না দেখতুম! আহা বেচারা ভাত কোলে করে খেতে বসেছিল গা! কি দুটো কথা কাটাকাটি হয়েছে কি না হয়েছে, এই এমন করে নাতি মেরে ভাতের থালা উলটিয়ে দিলে গা!"

কণে বৌএর লাথিতে সামনের ঘটিটা উল্টে যায়।

ঘটিটা আবার সোজা করে রেখে রাণী বলে, "হ্যাঁ মা, আমি দেখেছি মা—!"

'তুই থাম্‌'—পদ্ম উঠে যায়।

একটা কিছু সত্যিই হয়ে গেছল। ঘরময় ভাত ছড়ান। হাবা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চুপ করে বসেছিল; দরজায় পটলি গুম হয়ে বসে কি ভাবছিল সেই জানে। আজকের ঝগড়াটা একটু নতুন রকমের তাহলে!

পদ্ম খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে বল্লে, "রোজ এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি ত সইতে পারব না পট্‌লি, রোজ একটা করে কেলেঙ্কারী অনাচার হবে—তোমার জন্যে এ আর আমার সয় না! তুমি বাপু ভেন্ন ভেরা দেখ।"

বিষ্ণু এতক্ষণ বোধ হয় পদ্মকে দেখতে পায়নি। এইবার দেখতে পেয়ে যথাসম্ভব দ্রুত ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে চৌকাঠের কাছে এসে বল্লে, "শুনেছ ত তোমরা! আজকের কাণ্ডটা শুনেছ ত; এখন বলে দাও ত ওকে সোয়ামীকে নাতি মারলে কি সাজাটা হয় নরকে; বলে দাও বেশ করে বলে দাও! তুমি ত ধম্ম টম্ম কর বাপু, সব ত জান, তুমিই বলে দাও না, দ্যায় কিনা করাত দিয়ে চড় চড় করে পা দুটো চিরে গণগণে আগুনে ঝলসে! মন্তর পড়ে বিয়ে, অমনি মুখের কথা কিনা, যা তা করলেই হল আর কি; —সব খাতায় লিখছেনা বসে চিত্তরগুপ্ত—এই সব!"

পদ্ম পটলির দিকে আবার ফিরে বল্লে, "তোমার জন্যই আমাকে টিটকারী সইতে হচ্ছেত! তুমি যদি সোয়ামীর গায়ে পা-ই তুলবে তবে তোমার গঙ্গাচান ঠাকুর দেবতা ওসব ঢঙের কি দরকার!"

পদ্মর হাতটা ধরে টেনে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বিষ্ণু বল্লে, "নাগো; বেশত দিনকতক সুমতি হল। তোমার সঙ্গে গঙ্গাচান করতে যেতে লাগল, সকাল বেলা উঠে দেখলাম মা কালীর পটের পানে চেয়ে গড় হয়ে পেন্নাম করে, আমাকে তুই তোকারী পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে—তারপর—"

কথাটা শেষ করা বিষ্ণুর হল না। ধমক খেয়ে চম্‌কে চুপ করে সে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে একবার মাত্র জানালে, "দেখলে ত তোমরা, সোয়ামীকে ইস্ত্রী এমন করে ধমকায়!"

"তোমায় আর অনাছিষ্টি কাণ্ড সইতে হবে না বাপু, আমরা নিজেরাই এখানে থাকবনা।"—পট্‌লি উঠে ঘরের ভেতর চলে গেল।

বিষ্ণু আর চুপ করে থাকতে পারল না, বল্লে, "থাকব না, থাকব না, হুঁ হুঁ আমি আর বুঝি না কিছু! কেবলি হচ্ছে থাকব না, থাকব না; এইবার যাবে ওই কামার পাড়ায়, ওই গোরাপানা, টেরীকাটা ছোঁড়াটা কদিনই দেখছি ঘুরছে এখান দিয়ে।"

ঘর থেকে পটলি দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্‌ল।—"ফের্‌ সেই কথা! এই নিয়ে সকালে অত হ'ল তবু নজ্জা নেই! কোথায় তোর বাবা পাকা ইমারতের বনেদ গেঁথে রেখেছে রে মুখপোড়া যে সেখানে গিয়ে উঠবি? এখানে ওমুক, ওখানে তমুক! কোন্‌ চুলোয় আমায় রাখলে তোর সোয়াস্তি হয়? একেবারে চিতেয়?"

"হ্যাঁ! চিতেয়! ভগোবানের কাছেত দিনরাত

মানছি,—তুই আমার সামনে মর্, আমি তোকে চিতেয় তুলে একটু নিশ্চিন্তি হয়ে জুড়িয়ে বাঁচি, আর পারিনা আমি তোকে রাতদিন চৌকি দিয়ে ছটফট্ করতে!"

এ আবার কি ঠাট্টা? হাবা আবার ঠাট্টা করে!

পদ্ম আর পটুলি একটু অবাক্ হয়ে বিষ্ণুর দিকে চেয়ে রইল! গলার স্বরটা কেমন যেন না!

হাবা তখন বলে যাচ্ছে, "কেন তোর এখান থেকে যাওয়ার এত তাগিদ শুনি? সকাল থেকে করছিস্, 'চলে যাব', 'চলে যাব',—কেন এখানে কিসের অসোয়াস্তিটা হল!"

"দেখ তবে কিসের অসোয়াস্তি? দেখ্ ঘাটের মড়া! আর তুমিও ছাখ ধোপামাসী! চিনতে পারবে বোধ হয়! কেলেঙ্কারী তোমার মত আমরাও ভালবাসি না।"

পটুলি খোঁপা থেকে খুলে সামনে ফেলে দিলে।

বিশেষ কিছু নয়।

একটা নীল কাগজের মোড়ক।

কাগজটা স্যাকরা বাড়ীর বলে মনে হয়।

ছুটি কাণের ফুল।

ফুল ছুটি পুরোণ, সদ্য পালিস করে আনা হয়েছে।

কিন্তু এমন ভারী ফুল ত বাংলা দেশে পরে না।

যেন হিন্দুস্থানী গড়ন না?

পদ্ম চুপ করে সে দিকে চেয়ে বসে রইল। পটুলি তখনও গর্জ্জাচ্ছে। "এইত দেখ্‌লি কিসের অসোয়াস্তি, এখন কি করবি কর্, দেখি! মরদ সোয়ামী; বিহিত কর্ একটা। ঘরের কোণে বসে বসে খালি কামড় খেলে ত চলবে না। একজোড়া জুতো সঙ্গে দিয়ে দে ওই ফুল ফিরিয়ে, বুঝি তবে মুরোদ!

এক কড়ার ক্ষ্যামতা নেই রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর— 'ওই কে হেসে চাইল।'—'ওই কে কাশল'; —'ওই কেন চুল বাঁধলি!' একেবারে খেপিয়ে দিলে গা!"

* * * *
* * *

মহাদেব একটু মুচকে হাসে—

একটু মুচ্‌কি হেসে বলে, "বেমালুম মাথায় হাত বুলিয়ে এলুম।"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার! বেশ শাঁসালো! তবে মাথায় বোধ হয় ছিট্ আছে, বলে—'রোজ বিকেলে আসবেত!' আমি মনে মনে বলি, 'ক্ষ্যাপা ভাত খাবি, না আঁচাব কোথা!' রোস্ না আর ছুদিন যাক্—"

কিছুদিন আরো যায়।

মহাদেব বলে, "লোকটা ক্ষ্যাপা রে। তামাম্ পাড়ার ছেলে জড় করেছে বাড়িতে; বলে, 'বিকেলে আমার এখানে ফুর্ত্তি করতে আসবে।' কাজ্‌লার অত বড় মাঠটা সব জমা নিয়েছে—যা খুশী খেল, ফুটবল, ক্রীকেট্, আবার বাড়িতে গান, বায়স্কোপ, থ্যাট, লেগেই আছে।

যে রকম দহরম, মহরম চলেছে, বেটার শিঙে ফুঁকতে আর দেরী নেই। আমি বাবা বেলা থাকতে হাতিয়ে নিয়েছি।

......দেখছিস্ কি? আসল বিলেতি গেঞ্জি,—চোখে কখন দেখিস্‌নি, আর ওই দেখ্ ছুজোড়া ব্যাট, জলে ফেলে দিলে ছকুড়ি টাকা!"

মহাদেব আরো বলে, "শেতলা তলার নন্দ আবার সকালে তাঁত চালাতে শেখে, ও-পাড়ার কেতো যায় ছুতোরগিরি শিখ্‌তে। আমরা বাবা ওসবে নেই, মিনি মাগ্‌না ফুর্ত্তি মিলছে, আছি—না মিল্‌লে টিকিটিও দেখ্‌তে পাবে না বাবা! তবে দেখ্ লোকটা ভাল, ক্ষ্যাপা হোক্, আর যাই হোক!"

আরও দিন যায়।

গগন দাঁত খিচিয়ে বলে, "কেন, এত রাত কেন রোজ রোজ নবাবের শুনি? কোথায় থাকে জিগ্‌গেস করতে পার না! কোন্ গেরস্তের বাড়ি এত রাত পর্য্যন্ত দরজা খোলা থাকে!"

কথাটা পদ্মকে লক্ষ্য করে মহাদেবকে শুনিয়েই বলা হয়।

মহাদেব যে বড় পাল্টা জবাব দেয় না!

মহাদেব নীরবে গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে।

ঘরের চেহারাও কেমন একটু নতুন না?

মহাদেব বলে, "বুঝেছিস্ রাণী, এই যে টেবিল দেখ্ছিস্ এ বিলকুল নিজের হাতে তৈরী, আর এই চেয়ার টাও। আর দেখ্ খবরদার ওমুগুর জোড়া কখ্খন নাড়বি না, পায়ে পড়লে পা একেবারে থেঁতো হয়ে যাবে।"

মহাদেবের আজ কাল আসতে রাত হয় বটে, দিনের বেলাও বাড়ী থাকে না।

কোথায় থাকে কে জানে?

পদ্ম জিজ্ঞেস করে, "তোদের যাত্রার দল কোথায় বস্ছেরে আজকাল?"

একটু হেসে মহাদেব বলে, "সে উঠে গেছে।"

"তবে কি করিস্ দিনভর্, একটু ঘরের কাজ দেখতে পারিস্ না। এই এত কাপড় আমরা দুজনে কেচে মরব, আর তুই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবি!"

"কাপড় কাচ্তে আমি পারব না"—মহাদেব মুখভার করে চলে যায়।

গগন বলে, "কাপড় কাচতে পারবে কেন, দুলাল ছেলে দুবেলা থালা ভরে ভাত মারতে পারবে! কাজ করতে না পারবে ত বলে দাও নিজে রোজগার করে খেতে। এখানে ভাত মিলবে না! আমি কি চাকর আছি যে গায়ের রক্ত জল করে উপায় করব আর তোমার নবাব নন্দন অন্ন ধ্বংশ করবে!"

মহাদেব কিন্তু জবাব দেয় না। নীরবে বেরিয়ে যায়। গগন বলে, "আজকাল আবার নতুন ঢঙ! বগলে খাতা-বই যাচ্ছে! ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হল বলে!"

খানিক থেমে আবার বলে, "তোমার কাছে ত জিজ্ঞেস করে একটা উত্তর পাবার যো নেই, সারাদিন ও কোথায় থাকে, কি করে বলতে পার? আর বলবেই বা কি, আমি কি বুঝিনা কিছু! ও ঠিক যায় সেই কামার পাড়ায়! এখান থেকে ছুঁড়িকে নাস্তা নাবুদ করে তাড়িয়ে ওর আশ মেটেনি, সেই কামার পাড়া পর্য্যন্ত ধাওয়া করছে আবার তাকে জ্বালাতে।

আচ্ছা, আমার চোখে কি পড়বেনা একদিনও।"

গগনের মুখ চোখ কিন্তু লাল হয়ে ওঠে।

পটলির কথা তোলাটা বোধ হয় ভালো হয়নি।

পটলিরা উঠে যাবার সময় যা কেলেঙ্কারী—দুটো পালিশ করা সোণার ফুল নিয়ে!

তবু পটলি স্পষ্ট করে কারো নাম ধরে বলে যায়নি!

* * *

মহাদেব নিজে থেকেই কাপড়ের মোটটা তুলে নিয়ে বলে, "চল্লাম মা!"

পদ্ম অবাক্ হয়ে বলে, "কোথায় রে!"

মহাদেব যেতে যেতে মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়, "ঘাটে—কাচতে।"

"এতদিন পর আজ যে এত সুমতি!"

মহাদেব উত্তর দেয় না। পেছন থেকে পদ্ম মুগ্ধ হয়ে ভাবে—বোঝা বইবার মত চওড়া পিঠ বটে!

আসবার সময় কামার পাড়া দিয়ে ঘুরে আসে!

শুধু ঘুরে আসে, আর কিছু নয়!

পথটা ভাল নয়, অনেকটা ঘুরও হয় বটে!

তা হোক্। এমন সে হামেশাই আসে!

(ক্রমশ)

অতৃপ্ত

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

এত কাছে তুমি, প্রিয়া, আমিও ত কাছে
তবু যেন দোঁহে দূরে দূরে,
তবু যেন মনে হয় তোমায় আমায়
মিশি নাই দোঁহা ভরে' পূরে'।
এত ত চুম্বন, প্রিয়া, এত আলাপন,
তবু তোমা আরো পেতে চাই ;
তবু যেন মনে হয় কি জানি কোথায়
জাগে তৃষা, আশা মেটে নাই।
আরো বুকে আরো প্রাণে যত আনি কাছে
তবু যেন কোথা রহে দূর ;
কেমনে তোমারে, প্রিয়া, আমার মাঝারে
করে' রাখি সর্ব্ব-পরিপূর ?

তিল

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়ে,

তোমার গালের ঐ যে কালো তিল,—
মন ভুলালো, মন ভুলালো মোর!
সুধার ধারা ঝর্‌ছে অনাবিল,
বুঝ্‌তে নারি কি গুণ আছে ওর!
অতল দিঘীর নিকষ কালো জল,
বেঁকিয়ে গ্রীবা মরাল নাচে তায়!
লাল গোলাপের এলিয়ে-পড়া দল,
ভ্রমর বঁধু লুকিয়ে চুমা খায়!
সিরাপ-রাঙা পদ্মপলাশ চোখে,
কোন্ রূপসীর উজল কালো তারা!
শিউলী বোঁটায় একটি কালির ছিটে,
রূপ-সাগরের অরূপ রতন পারা!
একটি চুমা তোমায় দেব প্রিয়ে,
তোমার গালের ঐ তিলেরে ঘিরে!
ওষ্ঠ আমার, অধরসুধা পিয়ে,
লোভের বশে আস্‌বে ঘুরে ফিরে।

সেয়ানে সেয়ানে

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কখনও বলে জ্যোতির্ভূষণ, কখনও বলে জ্যোতিষার্ণব।

বলে, "একই কথা ; একই মানে।"

বঁড়সির মুখে টোপের মত শিখায় বাঁধা ফুল, লাল রঙে ছোপানো ধুতি, গায়ে হলুদ-রঙের নামাবলী,—কলিকাতার একটা বড় রাস্তার ধারে, সুমুখে ছক্ পাতিয়া বসে, – গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, আর কপালটা তার সিঁদুরে-চন্দনে লালে লাল।

পাহারাওয়ালা বলে, "হাট্ হাট্! ই-ধার্ ন,—উ-ধার্!

আঙুল বাড়াইয়া পাহারাওয়ালা সুমুখের ফুটপাথ দেখাইয়া দেয়।

ছানি-পড়া ঘোলাটে বাঁ-চোখটা পাহারাওয়ালার দিকে তুলিয়া জ্যোতিষী বলে, "হুঁ। কপাল তোমার অতি মন্দ বাবা।-হাত-পা দেখতে হয় না আজকাল, কপাল দেখেই মানুষ চিনি।"

তাহার পর সুমুখের রাশি-চক্রটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে থাকে ; বলে, "উহুঁক্! এ ফাঁড়া আর উৎরোয় না দেখ্‌ছি!"

হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা বাংলা বোঝে না।

লোকজন কেহ না থাকিলে তাড়া খাইয়া জ্যোতিষীকে উঠিতে হয়। রাশি-চক্রের ছক্, ঠিকুজি, কোষ্ঠী, হাত-আঁকা কাগজপত্র, পঞ্জিকা, মাদুলি, আর বসিবার আসনখানি বগল-দাবা করিয়া রাস্তা পার হইয়া ও-ধারের ফুটপাথে গিয়া দাঁড়ায়।

চানাচুর-ওয়ালা নড়ে না ;—গোলদিঘির একটা দরজা আগ্‌লাইয়া সে বসিয়া থাকে। পাশের রেলিংএ গেঞ্জি টাঙাইয়া পাঞ্জাবী-লোকটা রুপিয়ামে পাঁচ-পাঁচঠো রোমাল হাঁকে। তার পাশেই বসে একজন হিন্দুস্থানীগামছাওয়ালা। লাল, নীল, রং বেরঙের চৌখুপ্পি ডোরাকাটা এলোকেশী,—কত রকমের কত গামছা……রেলিংএর অনেকখানা জুড়িয়া বাতাসে ফুর ফুর করিয়া ওড়ে। জ্যোতিষী টিকি নাড়িয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়ায় ; একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলে, "বেশ গামছা।"

গামছাওয়ালা খুশী হইয়া বলে, "গবুদা সাঁফ্ করে একদম বুরুষকা মাফিক। ইয়ে—জোড়া মিলেগা চৌদা আনা।"

রেলিং হইতে একটা গামছা খুলিয়া লোকটা তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিতে যায়, জ্যোতিষী বলে,

"আজ থাক্।—কিন্তু তুমি বাবা এইগুলো একটু সরিয়ে নাও দেখি—এইখানে বসি।"

"বাংগালী আদ্‌মী বহুৎ চালাক—।"

গামছাওয়ালা বেজার হইয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। তাহার পর আবার কি-যেন বলিতে যায়, এমন সময় তাহার খরিদ্দার আসে। বলে, "হাঁ বাবুজি, পান্‌সিকি জোড়া।"

জ্যোতিষীর আর জায়গা মিলে না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকায়।

পাকা পাকা দাড়ি-গোঁফ্ ও চুলের বোঝা লইয়া বুড়া এক বাঙালী ভদ্রলোক, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মহৌষধী বিক্রি করিতে আসেন। সাদা ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ্ হইতে আগাছার শিকড়গুলি সযত্নে বাহির করিয়া বলেন, "এত কাছাকাছি বসলে খদ্দের আসে না, শুনছ হে, বলি—ওহে গণক ঠাকুর!"

গণক ঠাকুর ফিরিয়া চায়—।

ব্যাগটি রেলিংএর ফাঁকে গুঁজিয়া রাখিয়া ভদ্রলোক বলেন, "আর একটুখানি সরে' বাপ্—বুঝলে?"

অগত্যা তাহাকে আরও একটুখানি সরিয়া যাইতে হয়। সরকারী একটা পায়খানার কাছাকাছি।—

ভীষণ দুর্গন্ধ ওঠে।

পাশেই একজন খোঁড়া অন্ধ ভিখারী হা হা করিয়া বুক চাপড়াইয়া চেঁচায়।

জ্যোতিষী তখন আসনের উপর চোখ বুজিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া থাকে। যেন ধ্যানে বসিয়াছে! দুর্গন্ধে নিশ্বাস তাহার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসে।

আবার মাঝে-মাঝে মিট্ মিট্ করিয়া না তাকাইলেও চলে না।

লোকজন আসে।

কেহ বা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না, আবার কেহ বা জ্যোতিষীর ধ্যান-মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়ায়।

লোক দেখিলেই তাহার ধ্যান ভাঙে।

চোখ খুলিয়া জ্যোতিষী তাহাকে আহ্বান করে; মুখের পানে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হুঁ। ফলাফল মন্দ বলে ত মনে হয় না বাবা, আচ্ছা বসো। ললাট চক্রে···"

লোকটি হাত দেখাইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ধীরে ধীরে সেখান হইতে সে চলিয়া যায়। চানাচুর-ওয়ালার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "চিনাবাদামের সের কত হে?"

লোকটা বোধহয় শুনিতে পায় না।

সে আবার ফিরিয়া আসে। ছেঁড়া খবরের কাগজের উপর পোঁট্লা-বাঁধা সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মহৌষধীগুলির পানে আড়চোখে তাকায়, তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া বুড়ার কাছে গিয়া বলে, "কিসের ওষুধ?"

বুড়া বলে, "ওষুধ অনেক রকমের। ব্যারামটা কি শুনি!"

লোকটা প্রথমে কিছুই জবাব দিতে পারে না, ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া গিয়া বলে, "জ্বর আসে রোজ।"

তাহার পর একটুখানি থামিয়া বলে, "গেল ফাগুনে জ্বর খুব বেশি হয়েছিল······আর বমি। লাল রঙের······ঠিক যেন রক্ত।"

বুড়া ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলে, "কাঠ বমি।"

কাঠির মত রোগা লোকটি তখন ফুটপাতের উপরেই উবু হইয়া বসে। বলে, "পিঠে বেদনা, আর থক্ করে থুতু ফেল্‌তে গেলেই রক্তের ছিটে······এখনও ওঠে।"

বুড়া তাহার দাড়ি ও ঘাড় এক সঙ্গে নাড়িয়া বলে, "ও কিছু না।"

বলিয়াই নীল কাগজে জড়ানো পোঁট্লাটি তুলিয়া তাহার হাতে দিতে যায়—"এইটি হচ্ছে রক্তওঠার বেহ্মহস্ত। তা সে যেদিক দিয়েই উঠুক্। নাক, কান, মুখ, চোখ... শিলের উল্‌টো-পিঠে আচ্ছা করে' বেঁটে······এই চারটি খানি ইসবগুল—"

লোকটি বলে, "আজ থাক্। আজ আর পয়সা-টয়সা······"

ছেঁড়া জামার পকেটে হাত দিয়া বলে, "আচ্ছা, এ··· এ···এই ওষুধের দাম কত?"

বুড়া বলে, "বেশি কি আর নেবার জো আছে বাবা,—সোয়া পাঁচ আনা।"

"কাল আসব।"

লোকটি উঠিয়া গিয়া গোলদিঘির ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া যায়।

জ্যোতিষী এইবার মুখ ফিরাইয়া বুড়ার মুখের পানে চাহিয়া বলে, "কি খবর দাদা?"

বলিয়াই একবার মুখ টিপিয়া হাসে।

বুড়া বলে, "বাজার মন্দা। আমাদের উঠ্‌তে হলো।"

জ্যোতিষীর কাছে সেদিন এক ছোক্‌রা আসিয়া

হাজির! গ্রীষ্মকালের দুপুর। ঘামে তার আপাদ-মস্তক ভিজা; মনে হয়, জামা-কাপড় পরিয়াই জলে কোথাও ডুবিয়া আসিয়াছে।

ছোক্‌রা জিজ্ঞাসা করিল, "হাত দেখ্‌তে কত লাগে?"

ধ্যানের মাত্রা একটুখানি বাড়াইয়া দিয়া জ্যোতিষী চোখ খুলিল, বলিল, "লাগা-লাগির কথা পরে হবে বাবা,—জিরোও, তুমি আগে বসো, মেড্ডুয়া দৈবজ্ঞি হলে না হয় পয়সাটাই আগে চেয়ে নিতাম। কিন্তু তা ত' আর হলো না বাপ্‌!"—

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া একবার চোখ বন্ধ করিল এবং পরক্ষণেই তাকাইয়া কহিল, "জন্ম তিথি মনে আছে তোমার? জন্ম তারিখ, কিম্বা জন্ম মাস?"

ছোক্‌রা একটুখানি থামিয়া চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উহুঁক!—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না ত!"

"নাম?"

"শ্রী তারকব্রহ্ম চৌধুরী।"

জ্যোতিষী একটা কাগজ-পেন্সিল লইয়া চার কোণা একটি ঘর আঁকিল, এবং সেই কাগজের উপর ১, ২, ৫, ৯, ক, চ, ঘ, ঙ,—এম্‌নি কয়েকটা অক্ষর লিখিয়া বলিল, "হুঁ—ঠিক ধরেছিলাম, ব্রাহ্মণ।—জন্মের রাশি হচ্ছে মকর··· কিন্তু—" বলিয়াই সে তারকের মুখের পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যি কথা বল্‌লে দুঃখু হয় বটে, অথচ না বলেও উপায় নেই।"

তারকব্রহ্ম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ বলুন,—বলুন!"

জ্যোতিষী গম্ভীরভাবে বলিল, "শনির দশা চলছে।"

"জানা কথা বাবা, নইলে দশবছরের চাকরি একদিনে যায় কখনও?"

জ্যোতিষী বলিল, "চুপ, চুপ! কিচ্ছু বল্‌তে হবে না—সব বলে দিচ্ছি। শেষে বল্‌বে—বেটা শুন্‌লে ত' ছাই, শুনে-শুনেই দিলে বলে'! দেখি হাতখানা দেখি!"

ডানহাতখানি সুমুখে বাড়াইয়া দিয়া তারক বলিল, "কিন্তু এ দশা আমার আর কদ্দিন্ চলবে বাবা?"

"বলি—"

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিড় বিড় করিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে জ্যোতিষী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হাতখানি দেখিল। বলিল, "হুঁ, তাইত, বলি! শনির সঙ্গে মঙ্গলের লড়াই বেধেছে বাবা, কিন্তু শনির সঙ্গে লড়াই,—সেত' কম কথা নয় বাপ্‌! তবে হুঁ, এই যে শুক্ররেখা—ইনিই মঙ্গলকে সাহায্য করছেন। শনি হটে' যেতে বাধ্য। ······বেশ ভাল চাকরি একটি তোমার হাতে আস্‌চে,—নিও বাবা, ছেড়ো না কিন্তু।"

তারক এইবার ফুট্‌পাথের উপরেই চাপিয়া বসিল, বলিল, "কবে আসছে বাবা?"

চোখদুটা তাহার ছলছল করিয়া আসিল।

হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতিষী বলিল, "প্রতি প্রসঙ্গে আমি চারটি করে' পয়সা নিয়ে থাকি বাপ্‌! প্রসঙ্গ তোমার ক'টি হবে?"

"আমার—?" বলিয়া তারক একটা ঢোঁক্ গিলিয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তাহাই ভাবিতে লাগিল। প্রশ্ন তাহার অনেক। ভাবিল, সবগুলাকে জড়াইয়া এক করা যায় না?

কিন্তু অনেক ভাবিয়াও সে তাহা করিতে পারিল না। বলিল, "জিজ্ঞাসা করবার ত' অনেক আছে বাবা; আচ্ছা, আর-কিছু কম······মানে এই দু'পয়সা করে'······?"

জ্যোতিষী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না, তা হয় না। আচ্ছা, যা দেবার, এই রাশিচক্রটির কোণে, এই 'চ'এর উপর নামিয়ে দাও, তারপর আমার বিবেচনা আমি করি। উপবীতধারী তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণো গতিঃ। বেদের বাক্যি, এর কি আর কাটান্ আছে বাপ্‌?"

তারক তাহার ভিজা জামার পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া পেন্সিল-আঁকা কাগজখানির উপর নামাইয়া দিল।

জ্যোতিষী সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার

তাহার ডান হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, "বল বাবা, কি বলতে হবে বল।"

তারক বলিল, "শনির দশা আর কতদিন থাকবে বাবা?..... আর ওই-যে ওই চাকরিটির কথা বললেন..."

"চাকরি হবে।"

জ্যোতিষী একবার চোখ বুজিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে মুখ তুলিয়া বলিল, "এই মাসের মধ্যেই হতো, কিন্তু না থাক্! তুমি অত খরচ করতে পারবে না। 'সূর্য্য কবচম্ যদিস্ত ধারয়েৎ মঙ্গলে কি বুধে কি রবিস্ত প্রাতে, শনির্দ্দশা গত মাসমেক মধ্যে।' জ্যোতিষশাস্ত্রে আমাদের এই কথাই বলে।" একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, "আবার—এও বলে, সূর্য্যকবচ যদি কোনও উপবীতধারী ব্রাহ্মণ উপবাসের পর বামবাহুমূলে ধারণ করতে পারেন—তাহ'লে সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ ঠিক্ এই একটি হপ্তার মধ্যে কেটে যায়—অচিরেই ধনবান, পুত্রবান, লক্ষ্মীমন্ত, যশোবন্ত হয়ে আশীবচ্ছর পর্য্যন্ত তিনি পরম সুখে বেঁচে থাকতে পারেন। যাক্—গরীবের ভাগ্যে তা আর জোটে না—এই জন্যই ত' বাবা—যত কষ্ট গরীবের। হুঁ, তারপর যা বলছিলাম বলি,......টাকা তোমার হাতে এসেছে, কিন্তু হাতে কিছু থাকে না,—আসে আর চলে যায়। তবে স্ত্রীস্ত পীড়া—ন চ গ্রহদোষম্।"

তারক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক্। তিনটে মাস ধরে'—"

"আ-হা-হা, থামো না; বলি,—বলতেই দাও! স্ত্রীর অসুখ—সে ত' তোমারই দোষে বাবা! তোমার গ্রহ-দোষ না কাটলে ত' মঙ্গল তোমার হবে না কিছুতে।"

তারক ঘাড় নাড়িল।

জ্যোতিষী বলিল, "স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হামেসাই হয়—একটু কম করে' করো বাবা।"

তারক বলিল, "ওর স্বভাব ভারি মন্দ! অসুখ শরীর, হাজার বার বারণ করি, তবু চব্বিশঘণ্টা চুলবুল করে' বেড়ায়।"

জ্যোতিষী হাত নাড়িয়া বলিল, "আহা থামো না, থামো না, বলতেই দাও আগে! লক্ষ্মী চিরকাল চঞ্চলাই হয়ে থাকেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ওই শনিগ্রহ—এক-দণ্ড 'থির' থাকতে দেয় না,—চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। হুঁ, যেদিন দেখবে—মঙ্গল গ্রহটি জয়লাভ করেছে—শনিগ্রহটি কাৎ হয়েছেন, ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা, এক'ট হপ্তার মধ্যে দেখবে তুমি......সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এইকথা আমি জোর করে' বলতে পারি—কই দেখি আর-একবার তোমার হাতটি দেখি!"

হাতটি আর-একবার তাহার হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া জ্যোতিষী বলিল, "হেঁ—ঠিক! এই শনিগ্রহটি যদি না থাকতো তোমার, তাহ'লে ওই পত্নীভাগ্যেই তুমি রাজা হতে। কিন্তু শনি তা দেয়নি। অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখু দিয়েছে, কিন্তু পারেনি বাবা, জীবননাশ করতে পারেনি—পারবেও না, তার কারণ, মঙ্গল আর শুক্র আছে পশ্চাতে।"

জ্যোতিষী তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিতেই তারক তাহা টানিয়া লইতেছিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ হাঁ হাঁ করিয়া আবার হাত বাড়াইয়া বলিল, "কই দেখি, দেখি দেখি—আবার কি যেন একটা নজরে পড়লো।"

হাতটি বাড়াইয়া ধরিয়া তারক বলিল, "দেখুন!"

জ্যোতিষীর মুখখানি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কেমন যেন হইয়া গেল, বলিল, "দেখ বাবা, তুমি একটুখানি নজর রেখো। তোমার পাশের বাড়ীর একটি লোক—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জ্যোতিষী একবার চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

তারক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া চুপি চুপি বলিল, "আর বলতে হবে না বাবা, সে আমি একদিন......"

জ্যোতিষী চোখ খুলিল। "না। স্ত্রী তোমার সতীলক্ষ্মী। মা'র নামে কলঙ্ক দিও না। ওই লোকটাই বদমায়েস্।"

তারক ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হুঁ।"

জ্যোতিষী বলিল, "কিন্তু মজা এম্নি, ওই লোক আর

থাকবে না, স্ত্রীর ব্যারাম সেরে যাবে, তোমার চাকুরি হবে—ছেলে-মেয়ে অসুখ-বিসুখে ভুগবে না—কিচ্ছু হবে না—যেদিন তোমার গ্রহদোষটি কেটে যাবে। লোকটার ওপর লক্ষ্য রেখো—কিন্তু লক্ষ্য রেখেও এখন তুমি কিছু করতে পারবে না বাবা!"

তারক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "সুয্যি-কবচের কত দাম?"

"দাম বেশি নয়, তবে তোমার আমার পক্ষেই বেশি। পুরশ্চরণ-সিদ্ধ সূর্য্য-কবচ আমার কাছে পাঁচটি ছিল—এখন আর মোটে একটি আছে। দেখি তাও আবার আছে কিনা!"

বলিয়াই জ্যোতিষী তাহার থলি হাতড়াইতে সুরু করিল। অনেক কষ্টে অনেকগুলা জড়িবড়ি বাহির করিবার পর, গালাআঁটা একটি তামার মাদুলি বাহির করিয়া বলিল, "এঁ—এইটি।"

তাহার পর মাদুলিটি একবার নিজের মাথায় এবং একবার তারকের মাথায় ঠেকাইয়া লইয়া বলিল, "দাম—তিনটাকা সোয়াদশ আনা। খরচ পড়ে তিনটাকা দশ আনা, আর একটি পয়সা মাত্র যজ্ঞেশ্বরের নামে তুলে রাখতে হয়।"

মাদুলিটির দিকে তারক একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, জ্যোতিষী বলিল, "শনির দশা তোমার আপনা থেকেই কেটে যেতে পারে, কিন্তু তার সময় লাগবে—অনেক।"

তারক হাঁ করিয়া তাহার কথাগুলা শুনিতে লাগিল।

জ্যোতিষী বলিল, "সারা দিন-রাতের মধ্যে একটিও মিছে-কথা বলতে পাবে না,—এম্নি করে' ভাঁহা সত্যি-বাদী হয়ে পুরো দশটি বছর যদি কাটাতে পারো, তা'হলে আর সূর্য্য-কবচের দরকার হয় না বাবা,—আপনা-থেকেই গ্রহদোষ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সে বড় কঠিন সাধনা বাপ্!"

তারক চুপ করিয়া রহিল।

জ্যোতিষী তাহার রাশি-চক্র-আঁকা কাগজখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কিছুদিন আগে তোমার ছোট ছেলেটির ভয়ানক অসুখ হয়, কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—হয়েছিল। রক্ত আমাশায়।"

"মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু তোমার মঙ্গলগ্রহ তাকে বাঁচিয়েছে। ওই ছেলে যদি বেঁচে থাকে, তা'হলে দেখো ও একদিন তোমার সব দুখ্ ঘুচিয়ে দেবে। ও-ছেলে তোমার হাকিম না হয়ে যায় না বাবা!"

তারকব্রহ্ম খুশী হইয়া ঈষৎ হাসিল।

"কিন্তু ভারি ছট্‌ফটে।"

"ওই ত!"

রাস্তার দু'চারজন লোক তখন জ্যোতিষীর চারিপাশে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জ্যোতিষী একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "এই যে বাবা, দেখি দেখি, তোমাদেরও দেখি। একা লোক—সবদিক পেরে উঠি না। আচ্ছা বাবা তারক-ব্রহ্ম, তোমার অঙ্গে কখনও অস্ত্রাঘাত হয়েছিল?"

তারকব্রহ্ম কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "কই না ত!"

"না হয়ে থাকে ত' শীগ্‌গিরি হবে।"

অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তারকব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিল, "সুয্যি-কবচ নিলেও?"

জ্যোতিষী তাচ্ছিল্যভরে হাসিল। বলিল, "হুঁ! স্বয়ং মহাকাল ফিরে' যাবে। বুঝেছ বাবা! সুয্যি-কবচের তেজে স্বয়ং মহাকাল এগুবে না।"

তারক তাহার ট্যাঁক্ হইতে চারটি টাকা বাহির করিল।

জ্যোতিষী তখন ধ্যানে বসিয়াছে।

সেদিন আর কেহই বাকি রহিল না।

যে পাঁচজন লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সকলেই কিছু-কিছু দক্ষিণা দিয়া হাত দেখাইল।

শেষের লোকটির হাত জ্যোতিষী কিছুতেই দেখিল না। চারিটি পয়সা দক্ষিণা দিয়া ডান হাতটি সে তাহার

সুমুখে পাতিয়া ধরিতেই, জ্যোতিষী তাহার মুখের পানে একবার কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়াই হাতটি তাহার সরাইয়া দিল।

"যাও, তোমার হাত আর দেখে না। আগে সেইটি ছাড়ো, তারপর হাত দেখাতে এসো।"

ব্যাপারটা যাহারা দেখিয়াছিল, অনেকেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাত যে ওর দেখলেন না ঠাকুর?"

জ্যোতিষী চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িল। মুখে একটি কথাও বলিল না।

সন্ধ্যায় পোঁটলা-পুঁট্‌লি তুলিয়া লইয়া জ্যোতিষী তাহার খড়ম্‌-জোড়াটি পায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, মহৌষধী-বিক্রেতা দাড়ি নাড়িয়া চোখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ ত' দেখি......"

জ্যোতিষী কোনও জবাব দিল না—মুখ বাঁকাইয়া একচোখে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হঠাৎ কি রকম পড়তা পড়িয়া গেল।

উপরি-উপরি দিন-কতক্‌ জ্যোতিষীর কাছে আর লোকের কামাই নাই। রোজগার মন্দ হয় না। কোনো দিন আট, কোনো দিন পাঁচ। বুড়া তাহার জড়ি-বড়ি লইয়া জ্বলিয়া মরে। মাঝে-মাঝে তাহার দিকে তাকায়। পাকা গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভিতর হিংস্র চোখদুইটা তাহার যেন জ্বলিতে থাকে।

কয়েকদিন পরে, বেলা তখন প্রায় দু'পহর গড়াইয়া গেছে,—নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল! এমন যে ঘটিবে, জ্যোতিষী নিজে ত' ভাবিতেই পারে নাই,—এমনকি ওই বুড়া পর্য্যন্ত না।

বছর-তিরিশের এক ছোক্‌রা,—কালো-কুচ কুচে গায়ের রং, ধুতিটা লুঙ্গির মত পরা, গায়ে একটা গেঞ্জি,—হাতে আংটি।

ট্যাঁক হইতে একটি আনি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর হাতের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া লোকটি বলিল, "এবার কঠিন পাল্লা বাবা, আমি কি চাই—সেই কথাটি বলতে হবে।"

বলিয়াই সে তাহার কোলের কাছে হাত পাতিয়া বসিল।

জ্যোতিষী চোখ খুলিয়া একবার তাহার মুখের পানে এবং একবার সেই আনিটির পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, "দেখি আগে,--অত ব্যস্ত হয়ো না।"

ছোক্‌রা বলিল, "খুব দেখ বাবা, উল্টিয়ে দেখ, পাল্টিয়ে দেখ,-যেমন খুশী তেম্‌নি করেই দেখ। কিন্তু বলা চাই।"

জ্যোতিষী তাহার হাতখানা দেখিতে দেখিতে আড়্‌-চোখে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইল। বলিল, "মনের কথা ত' হাতে লেখা থাকে না বাবা, ও-সব গণনা ভারি শক্ত।"

"শক্ত হোক্‌ নরম হোক্‌, বল।—হাতে না থাক্‌, যেখানে লেখা থাকে বল,-আমি দেখাচ্ছি।"

পানে-ছোপানো কালো-রঙের দাঁতের পাটি বাহির করিয়া লোকটা ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল।

দেখিলে গুণ্ডাই মনে হয়! জ্যোতিষীর রীতিমত ভয় করিতে লাগিল।

তাহার সেই কড়া হাতখানা হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন সব বলিতে বলিতে হাতের রেখাগুলি জ্যোতিষী অতিশয় যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

লোকটি বলিল, "নাও চট্‌ পট্‌—কাজ আছে, আমরা কাজের লোক।"

জ্যোতিষীও তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচে! কহিল, "প্রসন্ন কয়টি?"

"সে আবার কি ঠাকুর?"

বলিয়াই লোকটি আবার হাসিতে লাগিল।

জ্যোতিষী বলিল, "কি কি জিজ্ঞেস্ করবে কর।"

লোকটি বলিল, "পয়লা নম্বর বল—আমি কি চাই, আর কবে পাব।"

"প্রসন্ন-প্রতি একআনা,—দু'আনা লাগবে।"

ট্যাঁক্ হইতে আর-একটি আনি বাহির করিয়া লোকটি বলিল, "তাই নাও বাবা, এই নাও বাবা তাই দিচ্ছি।"

জ্যোতিষী বলিল, "যা তুমি চাও—শীগ্‌গির পাবে—মাসখানেকের ভেতর। কর্ম্মের ফল রয়েছে শুভ।"

"কি চাই পষ্ট করেই বল না বাবা!"

মানুষের আকাঙ্খার মধ্যে জ্যোতিষী যাহা চিরন্তন সত্য বলিয়া জানে—তাহাই বলিল। বলিল, "চাও—ধন, সম্পত্তি, টাকা।"

"তোমার মাথা!"

বলিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে লোকটা তেমনি বসিয়া বসিয়াই জ্যোতিষীর সেই শিখা-বাঁধা মাথাটার উপর খিঁচিয়া এক চড় বসাইয়া দিল।

"ভাগ্ শালা ভাগ্! টাকা! টাকা! টাকা নিয়ে তোর পিণ্ডি চট্‌কাব আমি!"

জ্যোতিষীর মাথাটা ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিয়াছিল, চোখের সুমুখে রাশিচক্র-আঁকা কাগজখানা যেন চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।

লোকটা বলিল, "টাকা! ঠকিয়ে পয়সা নেবার আর জায়গা পাওনি বুজরুক্? ফের্ যদি এখানে বসতে দেখি ত' ভুঁড়িটি তোমার ফাঁসিয়ে দিয়ে যাব—বলে' রাখলাম। ওঠ্ ওঠ্ ওঠ্! ভাগ্ শালা ভাগ্!"

আবার আর-এক চড়!

"হরে'-ব্যাটা আর লোক পায়নি,—এই বেটার কাছে এলো হাত দেখাতে! বলে কি না দেখ্‌ব না হাত।—সেটি ছাড়ো আগে। কি ছাড়বে রে বেটা,—কি ছাড়বে শুনি!"

লোকটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দে, আমার পয়সা দে।"

কিন্তু পয়সা দিবার অবস্থা তখন জ্যোতিষীর ছিল না। সে নিজেই তাহার আনি-দুইটি তুলিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল।

মজা দেখিবার জন্য লোক জড় হইতেছিল। জ্যোতিষী বলিল, "দেখুন মশাই দেখুন—দেখলেন ত? তুমিও ত' দাদা স্বচক্ষে—"

বলিয়া সে একবার মহৌষধী-ওয়ালা বুড়ার দিকে ফিরিয়া তাকাইল।

কিন্তু বুড়া তখন তাহার কাগজের পোঁট্‌লাগুলি সেইখানেই ফেলিয়া গামছাওয়ালার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"এলোকেশী গামছা তোমায় হাট থেকে আমদানী করতে হয়—না কি বল দাদা?"

পরদিন হইতে জ্যোতিষীকে আর সেখানে দেখা যায় না। কোথায় গেল তাহার আর সন্ধান মেলাই ভার!

মহৌষধী-ওয়ালা বুড়া বলে, "বুজ্‌রুকি করবার আর জায়গা পাওনি!......আছে এই শহরেই আছে বাবা কোন্ গলি-ঘুঁজিতে,—যাবে কোথায়? টাকা যে বড় মজার চিজ্ রে বাবা!......রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে,—মানুষ ত' মানুষ!"

অনেকদিন পরে দেখা গেল—শহর ছাড়িয়া জ্যোতিষী পাড়াগাঁয়ে ঘুরিতেছে। দেখিলে সহসা আর চিনিবার উপায় নাই। লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ি, মাথায় বাব্‌রি চুল, শিখার গুচ্ছ কিঞ্চিৎ মোটা হইয়াছে। কিন্তু ছানি-

পড়া ঘোলাটে' বাঁ-চোখটা ঢাকিবার কোনও উপায় ছিল না।

অধিকাংশ সময় সে মৌনী হইয়াই থাকে। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ—যাহা বলে, তাহাই হয়। হাত দেখিয়া—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সবই বলিয়া দিতে পারে। মুখ দেখিয়া লোকের মনের কথা টের পায়।

সকালে মেয়েদের ভিড় জমে। দুপুরে পুরুষেরা হাত দেখায়।

হাত দেখিতে দেখিতে সে গল্প করে,—

বলে, "শোনো বাবা শোনো। সে এক জোতিষী ছিল। পাড়াগাঁয়ে থাকে, খড়ি দিয়ে মাটিতে ঘর এঁকে গুণে-গেঁটে সব বলে দেয়। একদিন এক চাষা এলো—বলে, 'দেখ ত' ঠাকুর!'"

মাটির ওপর ঘর তার আঁকাই ছিল, বলে, "দে খড়িটা নামিয়ে দে একটা ঘরে।"

বাস্! জ্যোতিষী বলে, "চালে গোঁজা আছে দেখ্‌গে যা। পাবি।"

চাষা বলে, "সে কি ঠাকুর; আমার যে বাছুর হারিয়েছে!"

বলিয়াই জ্যোতিষী হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

বলে, "পথে-ঘাটে অমন অনেক জ্যোতিষী দেখতে পাবে বাবা—।"

পুরুষেরা হাঁ করিয়া শোনে।

তা বটে!

এ-উহার গা টিপিয়া দিয়া বলে, "আমাদের ধ্বজু-পণ্ডিতের মতন গণৎকার আর-কি!"

—"ধরম্‌দাসের মা বল্‌লে, 'দেখো ত' বাবা ধ্বজু, ধরমের জন্যে মনটা কেমন যেন উথোল্-পাথোল্ করছে, দেখ ত' বাবা বিদেশে-বিভুঁয়ে ছেলের আমার দেহি ভাল আছে কি না!' খড়ি দিয়ে ঘর এঁকে ধ্বজু অম্‌নি তড়াক্ বলে দিলে, 'খুব ভাল আছে, দিব্যি সুস্থ শরীলে পিসি,—এ যে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।—ওরে হাঁদা, আজ একটা কচি লাউ আন্‌বি দেখি পিসির ঘরে।'—বাস্! দুদিন বাদেই টেলিগেরাপ্ এলো—ধরম্ পটল তুলেছে কলেরায়! মাঝে থেকে ধ্বজুর লাউ খাওয়াটা হয়ে গেল।"

বলিয়াই সকলে হো হো করিয়া হাসে।

আড়ালে গিয়া বলাবলি করে, "কিন্তু এ'ভাই তেমন নয়,—এ বেশ পণ্ডিত লোক।"

কেউ বলে, "ছেলে বয়েসে আমার যে একবার ব্যামো হয়েছিল—সেটি পর্য্যন্ত বলে দিলে।"

"আর ওই রাজি-বাম্‌নীর বিধবা-মেয়েটাকে—?"

মাঝখান হইতে কে একজন বলিয়া ওঠে, "সেই-অবধি আমার তাঁহা বিশ্বেস হয়ে গেছে মাইরি! কেমন টপ্ করে বলে দিলে—শাঁকা-সিঁদুর না থাকলে কি হবে মা, তুমি সধবা।"

বলে, "আচ্ছা করেছে শালীকে! কিন্তু ওই জন্যেই ত ভয় করে বেটার কাছে যেতে রে ভাই! কোন্‌দিন কি পট্ করে' বেফাঁস্ কথা বলে' ফেলে বিশ্বেস কি?"

তবু যায়।

বলে, "বলে—বলবে। টাকাকড়ি আস্‌ছে কবে দেখি!"

কাহারও আসে,—কাহারও-বা আসে না।

যাহার আসে, সে বলে,—"গণনা একেবারে নিগ্‌ঘাত সত্যি।"

যাহার আসে না, সে বলে, "সব সত্যি হয় না, তবে কবচ-মাদুলিগুলো একেবারে অব্যর্থ।"

শনি মঙ্গলবার দু'দিন সকালে কবচ দেওয়া হয়, আশ-পাশের পাঁচ খানা গাঁ ভাঙিয়া মেয়ে আসে। মৃত-বৎসা আর বন্ধ্যার কবচই বেশি। সূর্য্য-কবচ, শনি-কবচ ত' আছেই! এমন কি, পুরুষেরা বলাবলি করে, বশীকরণের কবচও না কি পাওয়া যায়,—কিন্তু সে বড় গোপনে।

প্রসার প্রতিপত্তি মন্দ হইতেছিল না।

এক এক গ্রামে তিনদিনের বেশি থাকে না,—অথচ এ গ্রামে তাহার এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

না থাকিলেও চলে না।

মেয়েরা কবচ-মাছুলি লইয়া যায়, গ্রহশান্তির জন্য পূজা-অর্চ্চনা করায়, অথচ পুরুষেরা বলে, "দাঁড়াও না ঠাকুর, টাকাকড়ির টানাটানি—পয়সা ছুদিন বাদে দেব।"

জ্যোতিষীকে থাকিতে হয়।

থাকিতে থাকিতে জ্যোতিষ-গণনার ক্ষমতা তাহার একটু একটু বাড়ে।

দূরের গাঁ হইতে গরুর গাড়ী করিয়া সেদিন একটি মেয়ে আসিল—গায়ে এক-গা গয়না।

জ্যোতিষী ধ্যানে বসিয়াছিল, চোখ খুলিয়া চাহিতেই দেখিল, গলায় আঁচল জড়াইয়া মেয়েটি হাঁটু গাড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছে।

চোখোচোখি হইতেই মেয়েটি চোখ নামাইয়া হেঁট-মুখে হাতজোড় করিয়া বসিয়া রহিল।

সঙ্গে বুড়া শ্বাশুড়ী; কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, জ্যোতিষী হাতের ইশারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে চাই মা?"

বুড়ি বলিল, "হাঁ বাবা, কানা, খোঁড়া, যেমন হোক্ —একটি। বৌএর আমার বাঁজা-নাম ঘুচুক্!"

জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল, দুই চোখ বাহিয়া তখন তাহার দর্ দর্ করিয়া জল্ গড়াইতেছে।

কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বৌএর মুখের পানে তাকাইয়া জ্যোতিষী বলিল, "পাগল হয়েছিস মা? তুই যে রাজরাণী!"

বলিয়াই সে গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল।

শাশুড়ী বলিল, "কি দেখলে বাবা?"

"দেখলাম?—কই, তোমার বাঁ-হাতখানি দেখি মা?"

বৌ ধীরে-ধীরে তাহার বাঁ-হাতখানি সুমুখে বাড়াইয়া দিল।

হাতে হীরার আংটি, সোনার চুড়ি,—গায়ের রংএর সঙ্গে পাল্লা দিয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

হাতখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে জ্যোতিষীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিতেই হঠাৎ একসময় সে শিহরিয়া চোখ বুজিল। তাহার পর চোখ বুজিয়াই ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, "যদিস্যাৎ করতু মে বিশালাক্ষী পুত্রসম্ভবা—সপ্তমমাসে গর্ভপাতং অনিবার্য্য শনিস্থ অন্তর্গত রাহুঃ! বড় ভীষণ যোগ মা!"

কথাটা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও শ্বাশুড়ী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বলিল, "কি বললে বাবা?"

"বলি মা—বলি।"

বৌএর নরম হাতখানি নিজের লোমওয়ালা শক্ত হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াই জ্যোতিষী চোখ বুজিয়া পুনরায় ধ্যানে বসিল।

সেইদিন হইতে জ্যোতিষীর নামে একেবারে ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

দশখানা গ্রামের লোক অবাক!

বলে, "মানুষের মনের কথা বলে' দেয়—!"

আর, "যে যা চায় সে তাই পায়।"

স্বয়ং ভগবান......

কেদার মনে মনে বলে, "হুঁ, ভগবান!"

মুখে বলে, "ভগবান না ত' কি! মানুষের এত ক্ষেমতা হয়?"

লোকে বলে, "হ্যাঁ বাপু, আমরা না হয় ঘরেই বসে' থাকি, কিন্তু তুমি ত' আর ঘরে থাকোনা, কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও,—দেখেছ কখনও এমনটি? শুনেছ কখনও কেদার?"

তাহার পর আবার বলে, "উনি দেব্‌তা না ত' কি ঘোড়ার ঘাস কাটছেন বসে'-বসে' ?—আর আমি-শালা এমনি বেকুব যে, পড়ে' আছি চব্বিশঘণ্টা—কাজ নেই, কম্ম নেই, মাগ নেই, ছেলে নেই······ ?"

চণ্ডীমণ্ডপের এককোণে কেদার বসিয়া থাকে, উঠিয়া যাইবার সময় জ্যোতিষীর সুমুখে লম্বালম্বি মাটিতে লুটাইয়া একটি প্রণাম করে, তাহার পর পায়ের চারটি ধূলা লইয়া, চোখের ডিমি দুইটা উল্টাইয়া দিয়া, নিতান্ত আর্ত্তস্বরে ডাকিতে সুরু করে—"বাবা! বাবা!"

জ্যোতিষী হাত তুলিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলে সে উঠিয়া যায়। বলে, "তুমিই ধন্য বাবা, মানবজন্ম তোমার সার্থক!"

কিন্তু কেদার তাহার নিজের হাতটি জ্যোতিষীকে কোনদিন দেখায় নাই।

গাঁয়ের লোক বলে, "কই তোমার নিজের হাতটি ত' ওঁকে কোনদিন দেখালে না কেদার ?"

কেদার ঈষৎ হাসিয়া বলে, "নিজের হাত? নিজের হাত নিজেই জানি।"

লোকে মাঝে-মাঝে বলাবলি করে, "কেদার হয়ত' বাবাজির শিষ্য হয়ে গেছে। পায়ের ধূলো নইলে জল খায় না।"

কেউ বলে, "কে জানে বাবা,—অত ভক্তি ধোপে টিক্‌লে হয়—।"

সেদিন সারাদিন কেদারকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, কোথায় গিয়াছে কে জানে!

সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল।

বাবাজির কাছে লোকজন কেহ ছিল না। কেদার সরাসর তাহার কাছে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল, "বাবা—!"

জ্যোতিষী চোখ মেলিয়া চাহিতেই কেদার বলিল, "বাবা, একটি নিবেদন পাই!"

"কি ?"

"আপনাকে একবার যেতে হবে।"

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ?"

কেদার বলিল, "হরিণডাঙ্গার রাজবাড়ী বাবা!"

জ্যোতিষী চুপ করিয়া রহিল।

কেদার বলিল, "রাজকন্যের ছেলেপুলে হয় না বাবা,—ছেলে চাই! প্রভুর নাম করতেই রাজাবাবু বললেন, "একশো টাকা দেব—নিয়ে আয় তুই, আজ রাত্রেই নিয়ে আয়। কবচ নিয়ে কাল ও শ্বশুরবাড়ী যাবে!"

প্রভু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িল। বলিল, "না। তা হয় না।"

কেদার কাঁদ-কাঁদ হইয়া জ্যোতিষীর পা-দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "দয়া একবার করতেই হবে বাবা, নইলে আমার সব যায়। রাজার হুকুম। আমি কথা দিয়ে এসেছি বাবা।"

কেদারের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। পা সে কিছুতেই ছাড়ে না!

"জ্বালাতন করিস্ নে, ছাড়্, পা ছাড়্!"

জ্যোতিষী পা দুইটা তাহার টানিয়া সরাইয়া লইল।

কেদার বলিল, "দোহাই বাবা, জ্যোৎস্না রাত—মাইল-দেড়েক্ পথ,—দিব্যি চলে' যাব দু'জনে। রাতের খাওয়া-দাওয়া, দেখবেন খাতির-যত্ন দেখবেন······কাল রাজা-বাহাদুরের জুড়িগাড়ী এসে আপনাকে এইখানে পৌঁছে দেবে। না হয় তখন বলবেন, কেদ্‌রা-বেটার দোষ,—মাথায় পঞ্চাশ জুতো খাব গুনে' গুনে'!"

না-ছোড়বান্দা কেদারের দায়ে জ্যোতিষীকে রাজি হইতে হইল।

কেদার একবার তাহার বাড়ীতে দেখা দিয়াই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি বাঁধিয়া খড়ম পায়ে দিয়া বাবা প্রস্তুত।

কেদার বলিল, "বড় বোঁচ্‌কা থাক্‌—ওতে ত' বিছানা আছে, ওটা এইখানে রেখে যাই বাবা!"

"হাঁ ওটা রেখে এসো।"

বোঁচকাটা কেদার তাহার ঘরে রাখিয়া আসিল।

লাঠির ডগায় আর-একটা বোঁচকা কাঁধে তুলিয়া লইয়া কেদার রাস্তায় নামিল। বাবা তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে গিয়া পড়িল।

চাঁদের আলোয় মাঠের আ'ল্‌-রাস্তা দিব্যি ঝরঝরে পরিষ্কার। কখনও কেদার আগে জ্যোতিষী পিছনে, কখনও জ্যোতিষী আগে কেদার পিছনে।

দূরে রেল-ষ্টেশনের বিস্তর আলো জ্বলিতেছে। ষ্টেশন পার হইলেই হরিণডাঙ্গা।

মাঠের মাঝখানে একটা আমবাগানের পাশে প্রকাণ্ড একটা নালা পার হইতে হয়। বর্ষায় সেখানে জল থাকে—এখন শুকনো। উঁচু পাহাড় ধরিয়া অতি সাবধানে খালের ভিতর নামিতেই সম্মুখ এবং পশ্চাতের মাঠ, গ্রাম, ঝোপ, জঙ্গল আলো, ষ্টেশন—চোখের সুমুখ হইতে সবই যেন অদৃশ্য হইয়া গেল, মাথার উপর ঘোলাটে' আকাশ আর চাঁদের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

কাঁধ হইতে বোঁচকা নামাইয়া কেদার সেইখানে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

জ্যোতিষী কহিল, "বসলে যে কেদার?"

"হাঁ বাবা বসলাম, আপনিও বসুন!"

"কেন?"

বাঁ-হাতে লাঠি ধরিয়া ডানহাতখানি বাড়াইয়া দিয়া কেদার বলিল, "অনেক লোকের অনেক হাত দেখেছ বাবা, আজ এই বেশ নিরিবিলি বসে' আমার হাতটা... একবার..."

জ্যোতিষী একটুখানি হাসিয়া বলিল, "পাগল! এ সময় হাত দেখে না।"

"খুব দেখে বাবা, দিব্যি পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এই দেখ!" বলিয়া চাঁদের আলোয় কেদার তাহার হাত খানি তুলিয়া ধরিল।

জ্যোতিষী একবার আকাশের দিকে, একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "আয়।"

কেদার বলিল, "মুখ দেখে অনেক লোকের মনের কথা বলেছ বাবা, আমি কোনোদিন শুধোইনি কিছু... আজ বলতে হবে। কই আমার মুখ দেখে বল দেখি বাবা আমি কি চাই, আমার মনের কথাটি বল দেখি —শুনি!"

জ্যোতিষী বলিল, "বলব—এরপর বলব, আয়।"

জ্যোতিষী খালের আর-একটা পা'ড়ের উপর উঠিতে লাগিল। কেদারও উঠিল।—"চলো তবে একটু পরেই বলো।"

ষ্টেশনে একটা রাস্তার ধারে সারি সারি কয়েকটা খাবারের দোকানে আলো জ্বলিতেছিল!

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিল, "কেদার ক্ষিদে পায়নি রে?"

কেদার বলিল, "পেলেই বা খাওয়ায় কে বাবা?"

"আমি খাওয়াচ্ছি,—আয়।"

জ্যোতিষী তাহাকে একটা দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া বলিল, "নে, আমিও একটুখানি জলযোগ করে নিই। রাজবাড়ীর খাওয়া—কখন হবে তার ঠিক কি?"

নিজে যৎসামান্য লইয়া একটা ঠোঙা-ভর্ত্তি খাবার কেদারের হাতে তুলিয়া দিতেই কেদার সানন্দে বলিয়া

উঠিল, "অত কেন বাবা, অত কেন...এই যৎসামান্য কিছু..."

জ্যোতিষীর জলযোগ শেষ হইতে দেরী হইল না, কেদার তখনও খাইতেছিল।

হাত মুখ ধুইয়া জ্যোতিষী বলিল, "খাও বাবা খাও, আমি পান কিনে' আনি।"

দরজা হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া কেদারকে সে একবার অতি সন্তর্পনে সাবধান করিয়া দিয়া গেল, "পোঁট্‌লাটার দিকে নজর রাখিস্‌ বাবা—বুঝলি?" কেদার একবার পুঁটুলিটির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

হাত মুখ ধুইয়া কেদার অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল—জ্যোতিষী আর আসে না।

কেদার ঘন-ঘন পুঁটুলিটির দিকে তাকাইতেছিল।

দোকানদার বলিল, "কই গো আপনাদের পয়সা?"

কেদার রাস্তার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এই যে, আসুক্‌।"

কিন্তু আসে না।

কত লোক পার হইয়া যায়, কিন্তু জ্যোতিষীর দেখা নাই......

দোকানদার আর একবার তাগাদা করিল।

"এই যে তবে আমিই দিচ্ছি।"

কেদার ধীরে-ধীরে তাহার গচ্ছিত পুঁটুলিটি খুলিতে লাগিল।

অনেকদিনের অনেক কবচ-মাদুলির পয়সা! যাক্‌ কেদারকে আর বেশি কষ্ট করিতে হইল না।......

গেরুয়া রঙের ছেঁড়া একটি ধুতি দিয়া বাঁধা—প্রথমেই বাহির হইল—দুইটি আসন,—একটি কম্বলের, একটি কুশের; একখানি ছেঁড়া চাদর, একজোড়া পুরানো কাঠের খড়ম, ছোট একটি বালিস, এবং ভারি অনেকগুলা টাকা বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল—কেদার সবিস্ময়ে দেখিল, তাহা টাকা নয়, পয়সা নয়, ছোট বড় কয়েকটা মাটির ঢেলা আর দুইটা ইঁট!

কেদারের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

ছুটিয়া সে ওই বেটা জ্যোতিষীকে ধরিবার জন্য দোকান হইতে বাহির হইতেছিল, দোকানদার তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—

"আগে পয়সাটা দিয়ে দাদা—!"

পথ দিয়া যে যায় কেদার জিজ্ঞাসা করে, "দেখলেন মশাই একটি লোককে,—রঙিন্‌ ধুতি জামা, গায়ে নামাবলী, কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ?"

কেহই দেখে নাই।

অনেকক্ষণ পরে একটা লোক খবর দিল—

"দেখলাম যে! শাওতা গাঁয়ের সেই গণৎকার-ঠাকুর ত?"

জোরে জোরে ঘাড় নাড়িয়া কেদার বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ... ..সেই সে-ই......"

"সে ত' ওই সাড়ে-আটটার গাড়ীতে' চড়ে' বসল মশাই!—আমি জিজ্ঞেস্‌ করলাম, 'কোথায় যাচ্ছেন ঠাকুর?' বললেন, 'হরিদ্বার চললাম—পশ্চিম'।"

দোকানদার বলিল,—

"তবে আর-কি! দিন্‌ মশাই আমাদের পাঁচ-সিকে' পয়সা দিয়ে-দিন আপনি।"

"দেব রে দেব বাপু, পয়সা তোদের পালিয়ে গেল নাকি? ঘর থেকেই না হয় এনে' দেব—দাঁড়া!"

দোকানদার বলিল, "দাঁড়াবার অবসর নেই বাবু, চল তবে চল—থানায় চল।"

থানায়!

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা বাজে।

চুল-দাড়িওয়ালা একটা লোক কাঁদিতে কাঁদিতে থানায় আসিয়া হাজির !

ইন্স্পেক্টরবাবু তখন বাসায়।

জমাদার-সাহেব বাহিরে আসিতেই লোকটা তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

কিছুতেই ছাড়ে না ; বলে, "ডাইরি একটি লিখে নিন্ হুজুর ! আমি ঠিক্ ধরে দেব শালাদের। সব ব্যাটাকে চিনি আমি।"

ব্যাপারটা এমন বিশেষ কিছুই নয়—।

শাঁওতা-গাঁ ষ্টেশনটা পার হইয়া সোজা যে রাস্তাটা হরিণ ডাঙ্গার রাজবাড়ীর দিকে চলিয়া গেছে—সেই রাস্তার উপর মার-পিট। পথ দিয়া সে চলিয়াছিল—হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল হইতে দুইটা লোক বাহির হইয়া তাহাকে ধরে।

বলে, "দে, যা-কিছু আছে—দে।"

সে বলে, তাহার কাছে কিছুই নাই।

ঠ্যাঙ্গাড়েরা শোনে না। বলে, "অনেক হাত দেখেছ বাবা—অনেক মাদুলি-বেচা পয়সা। নেই কি রকম ?"

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যায়। কোঁচড়ে দুইটি টাকা ছিল, বাহির করিয়া তাহাই সে তাহাদের দিয়া বলে, "সে কি বাবা! আমার নাম সেখ হিমায়েৎ মিঞা। হরিণডাঙ্গায় আমার ভাতিজা থাকে।"

কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক মার খাইয়া অনেক কষ্টে মিঞা-সাহেব ছুটিয়া পলাইয়া আসে। ইহারই একটা ডায়রী। জমাদার-সাহেব নিজেই লিখিয়া হইল।

কেদারের বিচার তখন শেষ হইয়াছে।

ইন্স্পেক্টরবাবু বলিয়া গেছেন, থানার একজন সিপাই তাহার সঙ্গে গিয়া বাড়ী হইতে সন্দেশের দাম আদায় করিয়া আনিবে।

ডায়রী লিখাইয়া হিমায়েৎ মিঞা বাহিরে আসিতেই কেদার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "মার-পিটটা ঠিক্ কোন্‌খানে হলো দাদা ?"

মিঞাসাহেব বলিল, "হরিণডাঙ্গার কাছাকাছি—সেই যে সেই একটা খাল পার হয়েই—"

কেদার জিজ্ঞাসা করিল, "চিনেছ ত' ঠিক ?...... ক'জন ছিল ?"

মিঞা-সাহেব দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "চিনি বললেই কি আর চেনা যায় রে বাবা! তবে ধরে' ঠিক্ দেবই একদিন।—আমরা বাবা সেয়ানের বাচ্চা ঘুঘু ছেলে।"

"তা তোমার দাড়িতেই মালুম।"

কেদার আর তাহার দিকে মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি-জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে'॥

কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি।
ডাক এলো তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

—নটীর পূজা

স্বরলিপি

শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II{ণ্সা -া দ্া দ্া । ণ্া-া -া -সা I সা া -া -া । া -া -া I ॥ (সা-ঋা জ্ঞা মা । মজ্ঞা-ঋা সা-ঋা)}I
বাঁ ০ ধ ন ছেঁ ০ ০ ০ ড়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ সা ০ ধ ন হ ০ বে ০

I দ্া -া দ্া-ণ্া | ণ্া -সা সা -া I সা -ঋা -জ্ঞঋা -সণ্া | -সা -া -া -া I দ্া -া ম্া -া |
ছে ০ ড়ে ০ যা ০ ব ০ তী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ মা ০ ভৈঃ ০

| দ্া -া দ্া ণ্া I ণ্া -সা সা -া | -া -া -া -া I সা -ঋা জ্ঞা -মা | মজ্ঞা -ঋা সা -া I
মা ০ ভৈঃ ০ মা ০ ভৈঃ ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ ভৈঃ ০ র ০ বে ০

I সা -দা পা দা | মপা -া জ্ঞা -া II
সা ০ ধ ন হ ০ বে ০

II {সা -দা দা -া | দপা -া পা -দাIমপা -া মা -া | মা -া মা -পাI পমা -া -া ণা | ণদা -া -া -াI
যাঁ ০ হা র্ হা ০ তে র্ বি ০ জ য়্ মা ০ লা ০ রু ০ ০ দ্র দা ০ ০ ০

I পা -া -া -া | -া -া -া -া I সা -পা -া পা | পা -া -া -মা I মা -দা -া -া -া -া -া -া }I
ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ অ গ্ ০ নি জ্বা ০ ০ ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I{দপা -া মা -া । জ্ঞা -ঋা জ্ঞা -া I {দ্া -া দ্া-ণ্া । ণ্া -া ণ্া -সা I সা -া সা া} । -া -া -া -া}I
ন ০ মি ০ ন ০ মি ০ ন ০ মি ০ সে ০ ভৈ ০ র ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

I{দ্া -া -া ম্া | দ্া -া দ্া -ণ্া I ণ্া -সা সা -া | সা -া -া ণ্া I ণা -ঋা -া -া | -া -া -া -াI
কা ০ ল্ স মূ ০ দ্রে ০ আ ০ লোক্ যা ০ ০ ০ ত্রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Iঋসা -া -া -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -ঋাIঋজ্ঞা -া -া -া | -া -া -া -া I জ্ঞা -ঋা মা জ্ঞা | ঋা -া সা -া}I
শূ ০ ০ ০ ন্যে ০ যে ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ দি ০ ব স রা ০ ত্রি ০

I{সা -দা -া দা | দপা -া পা -দা Iমপা -া পমা -া | মা -া মা -পা I পমা -া -া ণা | দা -া -া -াI
ডা ০ ক্ এ ল ০ তা র্ ত ০ র ০ ঙ্গে ০ রি ০ ব ০ ০ ক্ষে বা ০ ০ ০

দপা -া -া -া | -া -া -া -া I সা -পা -া পা | পা -া -া -মা I মা -দা -া -া | -া -া -া -া }I
জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ০ জ্র ভৈ ০ ০ ০ রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Iদপা -া মা -া | জ্ঞা -ঋা জ্ঞা -মা I ঋজ্ঞা -া ঋা -া । ঋা -া সা -া I
অ ০ কূ ল্ প্রা ০ ণে র্ সে ০ উৎ ০ স ০ বে ০

I দ্া -া দ্া-ণ্া । ণ্া-সা সা-া I সা-ঋা-জ্ঞঋা-সণ্া | সা-
ছে ০ ড়ে ০ যা ০ ব ০ তী ০ ০ ০ ০ ০ ০

া-া-া I দ্া-া ম্া-া | দ্া-া দ্া-ণ্া I ণ্া-সা সা-া । -া-া-
০ ০ র্ মা ০ ভৈঃ ০ মা ০ ভৈঃ ০ মা ০ ভৈ ০ ০ ০

া-া I সা-ঋা জ্ঞা-মা । জ্ঞঋা-া সা-া I পা-দা পা দা মা-পা জ্ঞা-া II
০ ০ ০ মা ০ ভৈঃ ০ র ০ বে ০ সা ০ ধ ন হ ০ বে ০

বিচিত্রা

বাংলায় মাসিক সাহিত্যের ব্যবসায়ে যাঁহারা দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ে অথবা অল্প দিনের দুন্দুভি-নাদে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, সাহিত্য-সাধনাকে তাঁহারা কে কি ভাবে কোন্ কোন্ দিক্ দিয়া নিজেদের পত্রিকায় ফুটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও—আজ থাক্। সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক গুলির স্বত্বাধিকারী-সম্পাদক মহাশয়েরা বাংলার সাহিত্য-সেবীর সত্যকার মর্য্যাদা অন্তর হইতে কতখানি দিবার সামর্থ্য রাখেন বা কতটুকু দেন,—সে কথাও আজ যাক্। আজিকার এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের বিষয় অত্যন্ত স্থুল এবং স্পষ্ট।

বাংলা সাহিত্যের রাজপথে বিরাট কারবার খুলিয়া ক্ষুদ্র পেয়ালার পরিবর্ত্তে ভাঁড়ে-ভাঁড়ে রস বিক্রয়ের সুমহৎ ভার যাঁহারা লইয়াছেন, তাঁহাদের বাৎসরিক লাভের অনুপাতে নিয়মিত রসের যোগান যাহারা দেয়, সকাল সন্ধ্যা রসের মোট যাহারা বহন করে, তাহাদের জীবন ধারণের কড়ি কে কয়টা দেন, এই অতি নীরস, গন্ধময়, মর্ম্মান্তিক কথাটা আজ তুলিতে চাই।

* *
*

মাসিক সাহিত্যের এই ব্যবসায়কে আরম্ভেই ডাহা লোকসানের ভরাডুবি হইতে বাঁচাইয়া, বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া দিনে দিনে আর্থিক অভ্যুদয়ের পথে আনিয়া দাঁড় করাইতে অনেক অর্থ, পরিশ্রম, কৌশল,—এমন কি যোগ্যতারও প্রয়োজন হইয়াছে, একথা মানি; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আজকের এই সৌভাগ্যের দিনে লাভের কড়ি জড়ো করিয়া ঘরে তুলিবার সময়, এতদিন ধরিয়া যাহারা লেখা দিয়া চিত্র দিয়া সময় দিয়া সামর্থ্য দিয়া সহায়তা করিয়া আসিয়াছে, আজও করিতেছে, তাহাদের ভাগ্যে অর্থ-নীতির কোন্ ধারা অনুসারে কতটা-কি আসিয়া পড়িতেছে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে।

* *
*

কাহারও একার লেখায় ও চেষ্টায় যদি একখানি কাগজ মাসের পর মাস গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত তাহা হইলে এই আলোচনাকে অনায়াসে অনধিকার চর্চ্চা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন নয়, পত্রিকার অবস্থা যখন স্বচ্ছল, ব্যবসাই যখন তার উদ্দেশ্য, তখন সেই পত্রিকার লেখক, চিত্রকর, সম্পাদক (যেখানে সম্পাদক স্বত্বাধিকারী নন) বা তাঁর সহকারীরা লাভের অনুপাতে কে কোন্ হারে কত পান, আর—সবাইকে দিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় নিজেই বা কত নেন, তাঁর দীর্ঘ কালের পরিশ্রম, দুর্ভাবনা, মূলধন ও বিষয়-বুদ্ধির মূল্য বাবদ কতই বা তাঁর ন্যায়ত প্রাপ্য, এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অস্বস্তিকর হইলেও এতটুকু ও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

* *
*

বড় বড় কাগজগুলি যে কাহাকেও কিছু না দিয়াই, সকলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিয়াই চালানো হয় এমন অসার অভিযোগ তুলিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। শুধু জিজ্ঞাসা এই যে যাহা দেওয়া হয় লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু?

তাহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া হয়? না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাওয়া যায়? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়া দেওয়া নয়?

অবশ্য ইহার কৈফিয়ৎ আছে।

প্রথম, লেখার বা ছবির কি আবার টাকা পয়সা দিয়া দাম হয়? এ সব ত অমূল্য বস্তু!

কোন্ দুঃসাহসী অরসিক ইহার যথাযথ মূল্য নির্ণয় করিবে?

দ্বিতীয়, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের সাথে অজস্র অকৃত্রিম সম্পাদকীয় কৃতজ্ঞতা যখন পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়, তখন লেখক বা চিত্রকরের গদগদ না হওয়াই মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচায়ক। তাঁর রচনা-প্রকাশ, নাম ও খ্যাতির জন্য তিনি ত ঐ পত্রিকার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ!

যাঁহারা আরও একটু সপ্রতিভ তাঁহারা বলেন:

আগে ত সকলকেই দিতাম। তার পর দেখি সেই সব লেখকই বিনামূল্যে অন্য কাগজে লেখা দেন। তাঁরা যখন নিজেরাই চান না, তখন আর অনর্থক আমরা ক্ষতি গুণি কেন? এত বিপুল প্রচার আমাদের,—এ কাগজে লেখা বার হওয়াই ত তাঁদের পক্ষে লাভের।......তবে আমরা দিই, যাঁদের লেখা না হলে আমাদের চলে না, আবার টাকা না হলে যাঁরা লেখা দেন না, তাঁদের আমরা দিই,—কিছু কিছু দিই।

কাহারও কাহারও স্পষ্টবাদিতা আবার ইহার উপরেও যায়।

"যাঁরা—দেবার মত, তাঁদের আমরা দিই, কিন্তু এর বেশী দিলে আমাদের পোষায় না। যে বাজার! এম্‌নিই লোকসান যাচ্ছে মহাশয়!"

* *
* *

এ চিত্রে যদি অত্যুক্তি না থাকে তবে এই ত অবস্থা!

ইহার মধ্যে পড়িয়া কি বাংলা সাহিত্যের গতি আহত হইতেছে না?

সত্যিকার সাহিত্যিক যাঁরা সাহিত্য-সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ এবং অবসর তাঁহাদের কোথায়?

সংসারের দারুণ অভাব ও অনটনের মধ্যে কতজনের সৃজনী-শক্তি ফুটিতে না ফুটিতেই নিঃশেষে ঝরিয়া গেল?

যে স্বল্প কয়েকজনের বা ফুটিল, তাও কত বাধা কত সংগ্রাম, কত অপচয়ের ভিতর দিয়া?

* *
*

অবশ্য অতিকায় মাসিক-পত্রের অধিকারী মহাশয় নিজের লোলুপ সমৃদ্ধির সঙ্কোচ সাধন করিলেও স্বাতন্ত্র্যকে না বিকাইয়া সাহিত্য-সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার দিন সাধারণ ভাবে আজও বাংলা দেশে আসে নাই; কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভার নিঃসংশয় পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে অথচ সাহিত্য-সেবায় নিজেদের একান্ত ভাবে উৎসর্গ করিতে চায়, এমন ধারা ক্ষ্যাপাও ত আমাদের এই অনাদৃত অবজ্ঞাত সাহিত্যের পথে দেখা দিয়াছে! জীবনে আর্থিক অভ্যুদয়ের কামনা তাহাদের কোনও দিনই নাই, সে-সুখস্বপ্ন তাহাদের জন্য নয়, তবু—অর্থ ত চাই!

—পদে পদে দারুণ অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া যখন দিশাহারা হইতে হয়, তখন সাহিত্য-ব্যবসায়ীর সুবিপুল প্রাসাদ ও উপকরণ-ভারগ্রস্ত নিষ্প্রাণ জীবন-যাত্রাকে প্রশান্ত চিত্তে হাসি মুখে গ্রহণ করিতে রীতিমত ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

* *
*

কিন্তু স্বত্বাধিকারীর স্বত্বসম্বন্ধে চেতনা যেখানে এত প্রখর সেখানে সুবিচারের আশা কোথায়?

সঙ্কীর্ণতার রুদ্ধ-পথে মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধি যখন নিজেকে হারাইয়া ফেলে তখন ত এম্‌নিই হয়!

বৎসরের পর বৎসর সাহিত্যের পথে থাকিয়াও হৃদয় যেখানে এমন অনুদার, লোভ যেখানে এমন সর্ব্বনাশা, সেখানে ভরসা করিবার কি থাকে?

সাহিত্য লইয়া সেখানে ত শুধু বিজ্‌নেস্!

মুরলীধর বসু

* *
*

বাঙ্গলা স্বরাজ্যদলে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সেই আভাষ কৃষ্ণনগরেই পাওয়া গিয়াছিল, তার পর যাহা বাকি ছিল

তাহাও কলিকাতার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের পর বেশ খোলসা হইয়া গেল।

* * *

বাঙ্গলার কংগ্রেস-স্বরাজ্যদলে যে সকল ভূতপূর্ব্ব রাজ-বন্দী যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন কিনা তাহা প্রমাণিত হয় নাই, তবে তাঁহাদের প্রতি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনেকে যে বিরূপ ছিলেন, তাহা জানা গেল। কারণ, পাছে তাঁহারা কিছু করিয়া বসিতে পারেন এই আশঙ্কায়ই কংগ্রেসের কর্ত্তারা তাঁহাদের সরাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত শাসমল তাঁহাদের গালাগালি করিয়া ছিলেন, তাহাতে আর কেউ যোগ দেন নাই। এ দিকে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়,—সবাই মিলিয়া তাঁহাদের সরাইবার ব্যবস্থা বিধিমতে করিলেন, তবে তাঁহারা শ্রীযুক্ত শাসমলের মত গালাগালি করেন নাই। তারপর সেনগুপ্ত, রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধবাদী চন্দ্র, সরকার, বসু প্রভৃতি সেনগুপ্তরা যে ভাবে রাজবন্দীদের সরাইলেন তাহা সমর্থন করেন নাই, তবে ঐ সকল কর্ম্মীদের উপর তাঁহারাও যে নারাজ ছিলেন, তাহা কর্ম্মীদের পূর্ব্বকৃত কার্য্যের উপর সুস্পষ্ট বক্রোক্তি করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

* * *

বাঙ্গলার কংগ্রেস-কর্ত্তারা এই সকল ভূতপূর্ব্ব বিপ্লব-পন্থীদের সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ রক্ষা করিতেন, এবং তাঁহাদের কাছ হইতে কি আশা করিতেন, কি না পাইলে ক্ষুব্ধ হইতেন, তাহা কর্ত্তাদের অনেকের কথার মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, এই সকল কর্ম্মীদের কার্য্য-করী সমিতি হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্যই দেখা গেল, ইহাদের সরাইবার পক্ষে। কারণ কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রস্তাব অর্থই যে তাঁহাদের তাড়াইবার প্রস্তাব ইহা কে না জানিত? কংগ্রেসে যদি দেশবাসীরই মতামত ফুটিয়া উঠে, তবে বাঙ্গলার মতামত বাঙ্গলার কংগ্রেসে তথা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা শক্ত হইলেও বর্ত্তমানে মানা ছাড়া উপায় কি?—

* * *

তারপর প্যাক্ট; প্যাক্ট ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দোষ দেখি না, কারণ সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্যাক্টের ব্যাপারে তাঁহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন। ভোটের মিথ্যায়, কত সত্য যে চাপা পড়িয়া যায়, তাহা কি আমরা জানি না? তবু তাহা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় কি?—কিন্তু এই লোক-সংখ্যার মতামতই 'একমতের' খপ্পরে ফেলিবার আয়োজন বরদাস্ত করা শক্ত।

* * *

কথাটা খুলিয়া বলি। কার্য্যকরী সমিতির ৬০ জন সদস্য। কথা উঠিল, প্রেসিডেণ্ট এই ৬০ জন লোককে লইয়া কাজ করিতে পারেন না, যদি না, এই ৬০ জনের মধ্যে ৩০জন তাঁহারই মনোনীত—মনোমত সদস্য হন। কার্য্যকরী সমিতি যখন কাজের জন্য, আর প্রেসিডেণ্ট না হইলে যখন কাজই চলিবে না, তখন প্রেসিডেণ্টকেই কার্য্যকরী সমিতির 'ভাঙ্গা-গড়ার' মালিক করিয়া দেওয়া হউক! কিন্তু গণতন্ত্র ত শুধু কাজের হিসাবই করে না, গণ-দেবতার হিসাবই যে সেখানে বড়। কাজ হাসিলের যন্ত্র ত গণ নহে; অনেক সময় অকাজের পথেই গণ-তন্ত্রের জয়ধ্বজা উড়ে। কাজের ব্যর্থতা আজ গণতন্ত্রের দৈন্য প্রকাশ করিলেও—গণতন্ত্রকে কোন তন্ত্রের খাতিরেই, হউক না সে কর্ম্মতন্ত্র, এক তন্ত্রের পায়ে লুটানো চলে না। চলিলে, বহু দুঃখ সহিয়া চির বঞ্চিত

জনগণ স্বাধিকারের যে মহিমাময় পথে আজ পা দিয়াছে, সেই যাত্রা-পথই তাহাদের রুদ্ধ হয়।

* * *

তারপর কাজের কথা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কথা এই যে, ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবপন্থীদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আসিতে দিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই, তবে কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থায় যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের কার্য্যকরী সমিতিতে রাখা চলে না, কারণ তাহা হইলে কাজই অচল হয়। এখন দেখা কর্ত্তব্য বিপ্লব-পন্থীদের বা যাঁহারা কার্য্যকরী সমিতিতে ছিলেন, তাঁহাদের কোন কার্য্যে কংগ্রেস কর্ম্মপন্থায় অনাস্থা দেখা গিয়াছে কিনা। তেমন কোন অনাস্থার প্রমাণ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রভৃতি দিতে পারেন নাই—শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিয়াছেন, কাউন্সিল প্রোগ্রামই এখন কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র বড় কাজ। হয়ত এইদিকেই গোল বাধিয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে ভূতপূর্ব্ব বিপ্লব-পন্থীরা তাঁহাদের কাউন্সিল প্রোগ্রামের সহায় হইবেন না। সুতরাং কার্য্যকরী সমিতিতে এমন লোককে স্থান দেওয়া দরকার যাঁহারা কাউন্সিল প্রোগ্রামের পক্ষে ধুরন্ধর হইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কাউন্সিল প্রোগ্রামই কংগ্রেসের একমাত্র প্রোগ্রাম নহে, না বর্ত্তমানে, না ভবিষ্যতে। কাউন্সিলের জবরদস্ত ক্যান-ভাসারদের কার্য্যকরীসমিতির মধ্যে ঢুকাইলে, কাউন্সিল-কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্য আরো আছে। যতটুকু বাঙ্গলার কংগ্রেস-কর্ত্তারা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে ইহাই মাত্র বুঝা গিয়াছে যে, কাউন্সিল প্রোগ্রামের 'নিদারুণ' ভক্তদেরই তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবপন্থীদের অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য মনে করিয়াছেন, আর কাউন্সিলের মুখ চাহিয়াই—তাঁহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। কিন্তু কাউন্সিল প্রোগ্রামের পরে, দেশবন্ধুর কথিত, আইন অমান্যের জন্য দেশকে যোগ্য করিয়া তুলিতে যে ধৈর্য্য, কার্য্য-কুশলতা, দেশ-প্রাণতার প্রয়োজন, তাহা, এই সকল কর্ম্মীদের বর্জ্জন করিয়া নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে দেখা দিবে কি?

* * *

আলিপুর জেল হত্যাকাণ্ডের মামলায় আসামীদের কঠোর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তিনজনের ফাঁসি—সাত জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হইয়াছে। বিচার হইয়াছে স্পেশাল ট্রাইবুনেলে। মামলার বিবরণ ও রায় পড়িয়া আসামীদের দোষসম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বলা চলে না। যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত দোষীর সাজা হউক, কঠোর সাজা হউক, ইহাতে দেশ-বাসীর আপত্তি নাই। কিন্তু বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া চাই। এই বিচার স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে না হইয়া সাধারণ আদালতে হইলে কোন কথা থাকিত না। দেশ-বাসী সহজেই এই কথা মনে করিবে যে, সাধারণ আদালতে এই সব মামলা প্রমাণিত হইত না বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অসংখ্য দোষীর সাজার ব্যবস্থা সাধারণ বিচারালয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় জুরীদের দ্বারা সম্ভব হইতেছে, স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল আবার কেন? স্পেশাল ট্রাই-বুন্যালের বিচারে দেশের লোক কখনো সন্তুষ্ট হইবে না। এই আইন তুলিয়া দিতে তীব্র আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। দোষীর সাজা হওয়া দরকার, কিন্তু একটিও নির্দ্দোষীর যাতে সাজা না হয় তাহা করা আরো দরকার।

* * *

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানগণ হিন্দুর বহু মন্দির কলুষিত করিয়াছে, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট (লীটন-সরকার) ইস্তাহার জারী করিয়া দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে মন্দির অপবিত্র ও মূর্ত্তিভাঙ্গা দুঃখের কথা বটেই—তবে, ব্যাপারটা এমন বড় নয় যে, তার জন্য হৈ

চৈ করিতে হইবে! ব্যাপারটা যে ছোট তাহাই দেখাইতে সরকার জানাইয়াছেন, মাত্র ১শত স্থানে (ইতি মধ্যে আরো বাড়িয়াছে) মূর্ত্তি ও মন্দির নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় এই শতেক মূর্ত্তি নষ্ট তেমন কিছু নহে; আর ইহাতে দেশের কয়জন লোকই বা যোগ দিয়াছে।

আমরা বলি, এত অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বিবাদী হিন্দুর ১ শত মন্দির ও মূর্ত্তি নষ্ট, পাঠান বা মোগল আমলে হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ আমলেও হয় নাই, এই লিটনী আমলেই হইয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুর মন্দির ও মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে যে-সে, রহিম-আবদুল ভাঙ্গে নাই। তাহা ভাঙ্গিয়াছে দুর্দ্দান্ত বাদসা-নবাব, সম্রাট্ বা তেমন কেহ; আর তাঁহাকে হিন্দু অত্যাচারী মন্দির-বিধ্বংসী বর্ব্বর বলিয়াই স্মৃতিপথে রাখিয়াছে। 'মাত্র ১ শত' মূর্ত্তি! লাট লিটনের এই ইস্তাহার জারি করিতে লজ্জায় মাথা নুইয়া পড়িল না! হিন্দুর আর লজ্জা কি,—হিন্দুত লজ্জার মাথা খাইয়াই পরাধীনতাকে ঘরের বস্ত করিয়া লইয়াছে। হিন্দুর দুর্ম্মতি দূর না হইলে দুর্গতিও দূর হইবে না।

* * *

মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজিবে কিনা, নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? যুক্তি না কি এই সমস্যা মীমাংসা করিতে পারিবে না; তবে কি লাঠি এই সমস্যার মীমাংসা করিবে? তা ও না। কারণ সরকার হিন্দু এবং মুসলমান দুই জনের লাঠি কাড়িয়া লইয়াছেন—এবং শান্তি রক্ষার জন্য, চিরকাল ইংরেজ আমাদের অভিভাবক হইয়া থাকিবেন। এই প্রশ্নের মীমাংসা ত' সরকারও করিতে পারেন, সাধারণ বুদ্ধি খরচ করিয়া, অথবা আইনের পাতা খুলিয়া। তা' পারেন বটে, কিন্তু যাহা পারা যায়, তাহাই যে সরকার করিবেন, এমন কোন কথা ত নাই। সরকার এই বাজনার প্রশ্ন মীমাংসা করেন নাই। কেন করেন নাই, সে কথা থাকুক; তবে মীমাংসা করিয়া ফেলিলে, নাবালক দ্বয়ের গোলযোগের সূত্র ধরিয়া অভিভাবকের একান্ত প্রয়োজনীয়তার দাবী করার সুবিধা হয় না। এই প্রশ্নের মীমাংসা যে সরকার শুধু এড়াইয়া গিয়াছেন তাহাই নহে, এক দিকে শিখ প্রোসেশানকে মসজিদের সম্মুখে যাইতে দিয়া ও আর এক দিকে রাজ রাজেশ্বরীর প্রোসেশন বন্ধ করিয়া মীমাংসার পথটাই জটিল করিলেন। লাঠালাঠির সোজা পথ রুদ্ধ রাখিয়া বাঁকা পথ খুলিয়া রাখিলেন; ফলে বাঁকা পথেই ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্যা বাড়িয়া গেল।

* * *

যাঁহারা মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন না হইলে স্বরাজ হইবে না, তাঁহাদের এ কথাটা বুঝিবার সময়ও আসিয়াছে যে জাতীয় রাষ্ট্র না হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে নানা বিঘ্ন নানা দিক হইতে উপস্থিত হইবে।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

সঙ্গীত সাগরের কর্ণধারগণ

একবাক্যে স্বীকার করেন যে স্বরের উজান তুলিয়া মাতাইতে ও নাচাইতে আর, বি, দাসের "অর্গাণা" অদ্বিতীয়। "অর্গাণার" তুল্য হারমনিয়ম এতাবৎ তৈয়ারী হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলে প্রস্তুত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুদীর্ঘকাল স্থায়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হারমনিয়ম।

সৌরীন্দ্র ফ্লুট হারমনিয়ম	ফোল্ডিং	জলসেটিনা	ক্লারিয়নেট
২০৲ ও তদূর্দ্ধ	১২৫৲ হইতে	৬৫৲ ও তদূর্দ্ধ	৫৫৲ তদূর্দ্ধ
ফ্লাজিয়নেট	**পিকলো**	**পরীমার্কা পিতল**	**কর্ণেট**
১০৲ ও তদূর্দ্ধ	৬৲ ও তদূর্দ্ধ	বাঁশী ১৲ ও তদূর্দ্ধ	৫০৲ ও তদূর্দ্ধ

ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের মুখপত্র

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

ওস্তাদের সাহায্য বিনা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষোপযোগী সচিত্র মাসিক-পত্র। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

ORGANA

"অর্গাণা"

সেগুণ কাষ্ঠের বাক্স সমেত

৪	অক্টেভ	ডবল রীড	মূল্য	৪৫৲
ঐ	,,	স্পেশাল	,,	৫০৲
,,	,,	ঐ বাস রীড	,,	৫৫৲
৩৷৷০	,,	ডবল রীড	,,	৬০৲
,,	,,	স্পেশাল	,,	৬৫৲
,,	,,	ঐ বাস রীড	,,	৭০৲

একমাত্র প্রস্তুতকারক

আর, বি, দাস

সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা ও গ্রামোফোন কোং'র এজেণ্ট

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলিকাতা ৪৩৬।

তার—ARBI DASS, কলিকাতা।

স্বদেশী ফুটবল!

আমাদের ফুটবল এত উৎকৃষ্ট কেন? কারণ সমস্ত বলই উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে এবং বিলাতী মজবুত লিনেন সূতায় নিজ তত্ত্বাবধানে ভাল কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকি, সেই কারণে আমাদের বল এত মজবুত ও মফঃস্বলে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার আকার (shape) কখনও খারাপ হয় না এবং ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী।

১নং ব্লাডার সহ ২৲, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩৲ ও ক্যাপলেস ৩৷৷০, ৪নং ৫৲, ৫নং ৬৲, ক্রাউন ১২ প্যানেল ১০৲, থাকিক্রোম ১১৷৷০, গ্লোরি ১২ প্যানেল ১০৲, ৪নং ৮৲, থাকিক্রোম ১১৷৷০, ৪নং ৯৷৷০, ফিল্ড মাষ্টার ১২ প্যানেল ৯৲, থাকিক্রোম ১০৷৷০, হিরো ১০৲ প্যানেল ৮৲, থাকিক্রোম ৯৷৷০, স্যাণ্ডো ৫নং ৭৷৷০, ৪নং ৬৷৷০, কলেজ ৫নং ৬৷৷০, ৪নং ৫৷৷০, ম্যাচলেস ক্রোম ১৮ পিস ১৪৲, কাউহাইড ১২৷৷০, বাহাদুর ৫নং ৬।০, ৪নং ৫।০, টিপলি ম্যাচ ৫নং ৫৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৩নং ৩৷৷০, স্যাটিসফ্যাকশন ৫নং ৬৸০, ৪নং ৫৸০, উইনার ৫নং ৬৲, ৪নং ৫৲, ম্যাগ্রেগার কাউহাইড ২২৷৷০, অকটোট্রপিক্যাল ব্লাডার ৫নং ২৷৷০, ৪নং ২।০, ব্লাডার ৫নং ২৲, ৪নং ১৸০, ৩নং ১৵০, ২নং ১৵০, ১নং ৸৵০, ইনফ্ল্যাটার বড় ২৸০, মাঝারি ২।০, ছোট ১৸০ রবার সলিউসন ।০, ।৵০, ৷৷০, বাংলা রুলবুক ।০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

স্বদেশী ফুটবল!!

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর—২৫৬, আপার চিৎপুর রোড, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

Post Box No. 477.

'বঙ্গবাণী'র সৌজন্যে

কালি-কলম

১ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল [৪র্থ সংখ্যা

বিচার

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

মানুষের জীবনটা যে কি তা' বুঝে ওঠা কি ভীষণ কঠিন নয়? কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে মিশবে তা' কেউ বল্‌তে পারে না!

প্রয়াগ-তীর্থে যমুনার তীরে ওই যে ছোট্ট সেবাশ্রমটি—ওটির কাহিনী ভারি বিচিত্র।

সকালে তিনজন গেরুয়াধারী যুবক বাইরের চাতালের ওপর ব'সে চটা-ওঠা এনামেলের গেলাসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চা খেতে-খেতে নিজেদের মধ্যে যে-সব কথা-বার্ত্তা বলছিল—তারি খানিকটা এই :—

প্রিয়রঞ্জন। স্বামীজি, কাল রাতে জমার চেয়ে খরচ হয়েচে তেত্রিশ টাকা সাড়ে তেরো আনা বেশী। আজকে আবার একটা বেড্-প্যান চাই-ই চাই।

লীলানন্দ। কেন? যেটা ছিল—কি হলো সেটা?

ব্রহ্মচারী শঙ্কর।—সেটা? সেই হাবাতে রুগীটা—সেই যেটাকে আপনি কাঁধে ক'রে আন্‌তে আপনার কাণ কামড়ে ধরেছিল—সেটা কাল রাত্তিরে রাগ করে লাথি মেরে বেড-প্যানটা বিছানা থেকে ফেলে একদম ভেঙ্গে দিয়েছে।

লীলা। আঃ, তোরা ভারি অসাবধান কিন্তু; জানিস্ যে ওটার বেজায় বদ মেজাজ—তবুও একলা ছেড়ে দিলি!

শঙ্কর। প্রিয়দা আগেই তা' এঁচেছিল; কিন্তু ওর জেদ, কেউ ঘরে থাক্‌তে কিছুতেই কিছু করবে না।

লীলানন্দ নিমেষে জল হ'য়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

শঙ্কর। কি হবে?

লীলা। হবে আর কি?—শাস্ত্রে আছে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—আর এতো হলো দরিদ্র নারায়ণের সেবা। ভয় কিরে? দুহাতি দেনা ক'রে চল্; যে শোধবার—সেই এসে একদিন বিল্‌কুল শুধে দিয়ে যাবে!

প্রিয়। আপাততো কিন্তু টাকাটা আসে কোত্থেকে—স্বামীজি!

লীলা।—নে-নে, তুই আর বৈদান্তিকের মত বাজে ভাবিস্‌নি—জানিস্? খোদা যব দেতা.........

তব ছাপ্পর ফোড়কে দেতা।

মিঠে গলায় যে এই কথাগুলি পূরণ করলে সে আর কেউ নয়, সংযুক্ত-প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী পিয়ারী বাঈ।

পিয়ারীর বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। গায়ে এক গা

গয়না। যৌবনে সমস্ত দেহটা যেন উচ্ছ্বসিত হচ্চে। রূপের কথা? যে দেখে তার মাথায় বিদ্যাপতির ভূত চাপে—নয়ন না তিরপিত ভেল!

হাত-দুখানি কপালে ঠেকিয়ে পিয়ারী বল্লে, প্রণাম মহারাজ।

বলা বাহুল্য—সবাই অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল, কেবল লীলানন্দ বল্লে,—কে? এই যে পিয়ারি বাঈজি। অদূরে একটা মোড়া ছিল—সেটাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, বসো পিয়ারি, ঐখেনে বসো।

শঙ্কর আর প্রিয়রঞ্জন—খানিকটা নির্লজ্জের মত, জিজ্ঞাসু চোখে—তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েই র'য়ে গেল।

চোখ ফিরিয়ে নেওয়া শক্ত!

২

রুগীদের ভার দীপ্তনরামের উপর দিয়ে প্রিয় আর শঙ্কর বেরিয়ে প'ড়লো—তাদের আশ্রমের ছোট ডিঙ্গিটা ক'রে, নূতন রুগী খুঁজে আন্‌তে।

এমনি ক'রে রোজ সকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে তাদের বার হতেই হয়। বৈরাগী জীবনের এই হলো রসদ-সঞ্চয়। রুগী নইলে কি ক'রে এই মানুষগুলোর দিন কাটে!

সব চেয়ে বিপদ ঐ ক্ষ্যাপাটাকে নিয়ে। যেদিন রুগী পাওয়া যায় না—সেদিন রাগে সে খাপ্পা হ'য়ে অন্নের একটা দানাও দাঁতে কাট্‌বে না।

হালে ব'সেছিল প্রিয় আর দাঁড় টান্‌ছিল শঙ্কর। নীল যমুনার ভারি জলে ডিঙ্গিখানা যেন পুতে ব'সে আছে। পরিশ্রমে শঙ্করের কপাল দিয়ে ঘাম ঝরচে। প্রিয়র মুখে খাড়া রোদ প'ড়েছে—তার তা খেয়ালই নেই।

শঙ্কর। পিয়ারীর নাম শুনেছিলুম বটে; আরো শুনেছিলুম যে তার মত রূপ অল্প মেয়েরই আছে—তবুও আজ অবাক্ করে দিয়েছে বাবা! উঃ, তার উপর কি সাজাই সেজেছে—

প্রিয়। দূৎ, ওর দশগুণ সাজে ও অন্য জায়গায়—আজতো নেহাৎ মামুলি পোষাকে এসেছিল।

শঙ্কর চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে বল্লে, এর চেয়ে ঢের বেশী সাজে! ও রাণী—না মহারাণী, কিরে?

প্রিয় হেসে বল্লে, ও যে টাকার কুবের।

শঙ্কর উৎফুল্ল হয়ে বল্লে, ওঃ তবে ত ঠিক! খোদা ছাপ্পর ফুঁড়েচে রে!

মাথার সঙ্গে চোখ দুটো ঈষৎ নেড়ে প্রিয় বল্লে, দূৎ, পাগল; স্বামীজি ওদের কাছ থেকে কানা-কড়ি পর্য্যন্ত নেবে না—দেখিস্।

শঙ্কর। বলিস্ কিরে—নেবে না? তবে কেন মিছে গেল?

প্রিয়। মিছে! জানিস্ পেয়ারীর বোন্ কস্তূরী—স্বামীজি ছাড়া যে আর কোন ডাক্তারকে ডাক্‌তেই দেয় না। এত বিশ্বাস! কস্তূরীর ভারি ব্যায়রাম।

শঙ্কর। তারপর?

প্রিয়। এদিকে স্বামীজির সব আজগুবি খেয়াল—এক পয়সা তাদের কাছ থেকে নেবে না। শুনেছি একদিন নাকি এক থাল মোহর এনেছিল।

শঙ্কর কপাল কুঁচকে বল্লে, এ আবার কি রকম? এ দিকে তো আশ্রম চলে না।

প্রিয়। আরো দিন কতক থাক্—বুঝবি স্বামীজি কি চীজ।

শঙ্কর লম্বা হাতে দাঁড় টেনে বল্লে, আর তুই বুঝি তার মল্লিনাথ।

প্রিয় হাঁক. দিয়ে বল্লে, শঙ্কর ভাই, দেখ্‌তো ঐ ঝোপ্‌টার আড়ালে কি একটা পড়ে না!

শঙ্কর। ঠিক্ বাবা! বলিহারি শকুনের চক্ষু তোমার!

সেদিনের শিকার এক বুড়ী!

৩

গভীর রাত।

লীলানন্দের পায়ে ঠেলা দিয়ে কে ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার।

কে?—কে?

দীপ্পন।

কেন দীপ্পন?

হাওয়া-গাড়ীতে এক মাঈজি এসেছে।

হাওয়া-গাড়ীতে যমুনার পুল পেরিয়ে সেই রাত্রে এসেছিল পিয়ারী বাঈ।

লীলানন্দ উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি পিয়ারি—কি খবর? এত রাত্রে যে!

কাঁদতে কাঁদতে পিয়ারীর গলা একদম ধরে অসম্ভব ভারি হ'য়ে গিয়েছিল, অতিকষ্টে সে বল্লে, স্বামীজি—একবার যেতে হবে, কস্তূরী বুঝি আর টেঁকে না।

নির্ব্বাক নিস্তব্ধ স্বামীজি ঔষধের বাক্স আর খান পাঁচেক বই নিয়ে গাড়ীতে চড়তেই সশব্দে গাড়ীখানা কেঁপে উঠে ছুটে চল্‌লো।

যমুনার শান্ত জলের উপর আকাশের ছবি ঝক্ ঝক্ করচে। দূরে গঙ্গাতীরে যাত্রীর দল স্তব গান করচে—তার জমাট আওয়াজে কেল্লার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য যেন আরো সুনিবিড়।

ধীরে ধীরে পিয়ারী বল্লে, সন্ধ্যার পর—কস্তূরী বহিন একখানা উইল ক'রেছে।

কোন সাড়া নেই।

এই স্তব্ধতা পিয়ারীর বুকে যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিলে। তার চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো; কিন্তু অন্ধকারে কেউ তা দেখ্‌তে পেলে না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে লীলানন্দ বল্লে, আহা! বড় ভাল মেয়েটি ছিল।

তাই বুঝি সে আমারই আগে চল্লো।

অন্যমনস্ক হ'য়ে লীলানন্দ বল্লে, হুঁ।

স্বামীজি!

কি পিয়ারি?

একটা কথা........

পিয়ারীর গলা যেন কে চেপে ধরেচে।

নির্ব্বাক প্রতীক্ষায় লীলানন্দ অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল।

কি কথা পিয়ারি?

কি তোমায় বল্লে সে?

মাথা নেড়ে লীলানন্দ বল্লে, নাঃ, সে কথা আর কাউকে বলা যায় না পিয়ারি।

তবুও?

সে কথা বল্‌তে পারি না পিয়ারি!

তা কি পার? সে যে তোমারই নির্দ্দয়তার কাহিনী স্বামীজি! তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য কতখানি দায়ী—ভেবে দেখেচ তুমি?

দৃঢ়তার সঙ্গে লীলানন্দ বল্লে, দেখেছি পিয়ারি—একটুও নই।

উঃ, কি কঠিন তুমি!

অন্ধকারের মধ্যে কি গাঢ় বেদনার হাসি লীলানন্দের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠ্‌লো!

ব্যথায় পিয়ারীর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো।

আঘাতের প্রতিঘাত তীব্রতর।

৪

শেষরাতে একলা গাড়ীতে লীলানন্দ ফিরছিল। তার বুকের মধ্যে বিশ্ব-সংসারের ব্যথা-সমুদ্র তোলপাড়।

কস্তূরীর শেষ কথাগুলো তখনো অন্তরের তারে নিঃশব্দ ঝঙ্কারে বাজচে!

স্বামীজি, স্বামীজি! এ জন্মে তুমি ধরা দিলে না; কিন্তু কোটি জন্মের তপস্যার ফলে একদিন তোমার পায়ে আশ্রয় পাবোই পাবো!

লীলানন্দ দুই বাহু দিয়ে বুকখানা চেপে ধরলে, ফেটেই বা যায়!

মনের গভীর নিভৃত ঠাঁই থেকে কে যেন কি বলতে চায়! সেই অকথিত বাণী শুনে নিতে লীলানন্দের এক-দিকে যত ভয়—অন্যদিকে তেমনি ব্যাকুল ইচ্ছা!

সন্ন্যাসী, কার গলা টিপে ধ'রে চিরদিনের জন্য মূক করে দিতে চেয়েছিলে? শুন্‌তে পাচ্চো কি বল্‌তে চায় সে?

অন্তরের নিস্তব্ধ বিজনে—ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে একই কথা—বার বার উচ্চারিত হচ্চে। সন্ন্যাসীর সকল সাধনা কি আজ ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?

কস্তূরি—কস্তূরি—

লীলানন্দ মাথা নীচু ক'রে শুন্‌তে পেলে বুকের মধ্যে কে বল্‌চে :—

কস্তূরি, কস্তূরি, কিছুই অসম্ভব ছিল না একদিন :—কিছুই অদেয় ছিল না—তোমায়—;

কিন্তু—

সিংহ গর্জ্জনে লীলানন্দ বল্লে,—

মিথ্যা কথা প্রেম অন্তর্যামী!

৫

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরির কর্ম্মহীন জুনি-য়ারের দল সর্ব্বাগ্রে কস্তূরী বাঈএর আদ্য-শ্রাদ্ধ সুরু ক'রে দিয়েছিল।

মৃণালাল তেবারি নেবালালের গা টিপে বল্লে, ভাই স্বামীজি তো বন্ গেয়া।

অম্বিকাপ্রসাদ বিদ্রূপ-কঠোর কণ্ঠে কোলা ব্যাঙের মত শব্দ ক'রে বল্লে, বন্-বন্।

চারিদিকে অট্ট-হাসির রোল উঠ্‌লো।

পিছন থেকে কান্তা-প্রসাদ ভাল ক'রে শোন্‌বার জন্য কাণের পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সো কোন্ 'চীজ হ্যায় ভাই?

কে একজন পাশ থেকে বল্লে, দিল্লিকা লাড্ডু—জান্‌তে হো?—দিল্লিকা লাড্ডু!

বাঙ্গালী দলে তোতলা জুনিয়ার তেজুপাল টেবিলের উপর চাপড় মেরে বল্লে :—

আ-আ গোই জাস্তম্—ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা টা—ল ল ল লং পট।

ঘায়ের মাছি!

৬

পূর্ণিমার চাঁদের আলো ধুলোর গাঢ় আবরণের ভিতর দিয়ে তখনো মেঘাচ্ছন্নের মত ঢিমে দেখাচ্ছিল।

লীলানন্দ আশ্রমের ঘাটের শেষ সিঁড়িটার উপর বসে—পা দুটো যমুনার জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে রেখেছিল।

দুপুরে প্রচণ্ড লু বয়ে পৃথিবীটাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিয়ে গেছে। বিকার-রুগীর জল পিপাসা—যেন কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হবার নয়!

স্বামীজি, পিয়ারী বাঈ এসেছে।

পাঠিয়ে দাও—এখেনে।

পিয়ারী এসে গোটা দুই ধাপ উপরে ব'সে পড়লো।

কি পিয়ারি?

কাল একবার যেতে হবে।

আমাদের যেতে নেই—গুরুর নিষেধ। শ্রাদ্ধ আমাদের দেখ্‌তে নেই।

পিয়ারী আঁচল থেকে একটা কাগজ বার ক'রে বল্লে,—সেই উইলটা।

আমি কি করবো?

তোমাকে যে সমস্ত সম্পত্তির মালিক ক'রে গেছে।

আমাকে?—আমি যে সন্ন্যাসী!

স্বামীজি......

বাড়ী যাও পিয়ারি।

স্বামীজি......

বাড়ী যাও বলচি।

কি আমার কসুর?

এ দুনিয়াতে কারুর কোন কসুর নেই—সব নসীব।

পিয়ারী ধীরে ধীরে বল্লে,—আমায় ক্ষমা কর স্বামীজি!

তা অনেকদিন আগেই করেছি······দেহের ক্ষুধা,... মনের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা—ওতে তোমার আমার কোন হাত নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় আপ্‌শোষ—এত বড় দুনিয়াতে তোমরা একটা মানুষ খুঁজে পাও না।

মাথা নীচু ক'রে পিয়ারী বল্লে,—এ অতি বড় সত্য কথা স্বামীজি—এখেনে মানুষ নেই, সব জানুবার!

একটা প্রচণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে লীলানন্দ বল্লে, আর একটা বড় আপ্‌শোষ র'য়ে গেল এ জীবনে—আমি কিছুতেই বুঝিয়ে দিতে পারলুম না তাকে যে তার অপরাধ বড় কঠিন!

কি অপরাধ ক'রেছিল কস্তুরী তোমার পায়ে স্বামীজি?

পিয়ারি, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—অপরাধ দিয়ে হয় না। ওটা তোমাদের ক্ষুদ্র কু-সংস্কার। সন্ন্যাসীর তপস্যার্জ্জিত পুণ্য, নর্ত্তকীর কোন কাজে লাগ্‌তে পারে না—পরের জন্মে······

কস্তুরীর অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। আত্মাকে অশান্ত ক'রে তোলার মত অধর্ম্ম আর নেই।

পিয়ারী হঠাৎ অসহ্য তীব্রতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, আর মানুষকে অন্যায় বিচার করা কোন্ ধর্ম্ম, স্বামীজি! যতই কিছু তুমি বল না কেন—জানি কস্তুরীর মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী।

পিয়ারী দ্রুতপদে চ'লে গেল।

লীলানন্দের মনে হলো—ভাদ্রের অমাবস্যার সমস্ত অন্ধকার যেন তাকে নিমেষে গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে।

জোড়হাত ক'রে সে বল্লে, প্রভু কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে থাকৃতে বলেছ; কিন্তু তাদের ঠেকিয়ে রাখে কে? তারা যে এই সংসারকে গ্রাস ক'রে ব'সে আছে।

খানিকটা ভেবে বল্লে,—সব কি প্রহেলিকা নয়? কামিনী-কাঞ্চন বাদ দিলে—কি বাকি থাকে?

৭

সকালে সেবাশ্রমের চায়ের পার্টিতে লীলানন্দের আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

তার টেবিলের উপর একটা কাগজের টুকুরোতে লেখা রয়েছে:—

প্রিয় শঙ্কর,

প্রয়াগ আমার সইল না। তোমরা এটিকে চালিও। ইচ্ছা হয় কস্তুরীর অগাধ সম্পত্তি কাজে লাগাতে পারো। পিয়ারীর সাহায্য পাবে।

ইতি তোমাদের
লীলানন্দ।

শঙ্কর গালে হাত দিয়ে ব'সে ভেবে-ভেবে বল্লে,—ঠিক বলেছিলে প্রিয়দা, স্বামীজি একটি অদ্ভুত জীব।

সেই দিনের ডাকে সদর-মঠ থেকে হুকুম এলো:—

স্বামী লীলানন্দ—

গুরুতর হেতু বশতঃ তোমাকে আর প্রয়াগে রাখা চলে না। তুমি অচিরে সদরে রওনা হবে।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
ব্রহ্মানন্দ।

প্রিয়রঞ্জন কাগজখানা শঙ্করের হাতে দিয়ে বল্লে, দেখলি, কেন নাস্তিক হয়ে যেতে ইচ্ছা করে?

ভালবাসার নিষ্ঠা

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

এই তো চোখের সামনে পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি প্রভাতে সন্ধ্যায়, আলোকে অন্ধকারে, বর্ণে গন্ধে, কত সুর কত ছন্দ নিয়ে কেবলি চলেচে ; এই ত পরমাশ্চর্য্য প্রাণের লীলা অনাদি-কাল থেকে বসন্তে শরতে চলেচে এই প্রকৃতির প্রাঙ্গণে আর মানব-হৃদয়ের অনুভূতির স্বপ্নলোকে! তবু তো হাজার মানুষ রাত্রির অন্ধকার থেকে নিদ্রার রুদ্ধগৃহ থেকে যখন বেরিয়ে আসে প্রভাত বেলা, তখন তো কোনো বিস্ময়কেই প্রত্যক্ষ করে না। বসন্তের কচি পাতায় হাওয়ার হিল্লোল আর আলোর কাঁপন, শরতের সুনীল আকাশ আর তার শেকালির গন্ধ, তরুণ-তরুণীর ভালবাসার বেদনা আর আনন্দ এ সবই তাদের কাছে মামুলি হয়ে গেছে। এ সব নিয়ে বেশি উল্লসিত হলে তারা অবাক্‌পানা চেয়ে থাকে, তারা এই পুরাণো জগতের এই সব অতি স্বাভাবিক এবং অতি পুরাণো ব্যাপার নিয়ে এতখানি উল্লাসের বা বিস্ময়ের অর্থই বুঝতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝে যে এটা হচ্ছে নিতান্তই ছেলে মানুষের লক্ষণ।

মোট কথা এই যে এদের কাছে কচি পাতা মানে কচি পাতা, যার অর্থ একবার চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়; পুনরাবৃত্তি করবার দরকার তাদের যাদের স্মৃতিতে সহজে কোনো কিছুই বসে না। এদের কাছে কিন্তু এই বিশ্ব-জগতের অর্থবোধ হয়ে গেছে। এদের কাছে জগতের সবই তত্ত্বের প্রাণহীন অভিধানে পরিণতি লাভ করেচে। কিন্তু বাইরের জগতের কচিপাতা যে সব সংজ্ঞার অতীত সব তত্ত্বের অতীত একটি নিতুই নব সত্য এ কথাটি তারা বুঝতে পারে নি। তারা তাই সব বস্তুকেই বোঝে তত্ত্ব হিসেবে, সত্য হিসেবে নয়। তারা বস্তুর ওপরটাকেই এক পলকে দেখে তার একটা লিষ্টি করে নিয়ে বলে, এটা এই আর ওটা ওই। তার পর আর সে বস্তুর পানে তারা চেয়েও দেখার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা ভালবাসে মূর্ত্তির কাঠামখানাকে, কিন্তু তার পরে তার ওপর নিমেষে যে সব রঙের খেলা চলতে থাকে সেটাকে তারা এতটুকু বিশ্বাস করে না, বলে ওটা অনিত্য, ওটা মায়া।

তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণই যে এই। তিনি খানিকটাকে আপনার রুচি মাফিক আসল বলে মেনে নেবেন আর তখন বাকিটাকে মায়া বলবেন। পরম সত্য যা তা হচ্ছে প্রাণের অনন্ত মায়া দিয়ে ঘেরা, তাই তো সত্য নিমেষে নিমেষে আপনাকে নতুন করে প্রকাশ করবার সাহস রাখে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ প্রাণকেই বাদ দিয়ে তার পর বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করতে আরম্ভ করেন। তত্ত্বজ্ঞের কাছে মানুষও এমনি ধারা একটি প্রাণহীন বস্তু মাত্র ; তাঁর কাছে মানুষ হচ্ছে মাংস মেদ মজ্জা ইত্যাদির একটি সমূহ, অথবা আশা নিরাশা শোক দুঃখ হর্ষ ভয় প্রভৃতির একটা জটিল জাল; সুতরাং মানুষের মধ্যে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকবার উপা-দান তিনি কিছুই পান না। সাধারণতঃ দার্শনিক হচ্ছেন এই তত্ত্বের উপাসক। তিনি বিস্ময়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেও পরিশেষে পরম ঔদাসীন্যের মধ্যে আপনার নিবৃত্তি লাভ করেন।

কবি ভাবুক আর প্রেমিক এই তত্ত্বের রাজ্যের ধার দিয়েও যান না। তাঁরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সত্যের পথে চলেচেন যেখানে প্রাণই হচ্ছে পরম সত্য। কিন্তু এও বলতে পারা যায় যে সত্য হচ্ছে প্রাণময় জীবন্ত, সৌন্দর্য্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের রসে ভরপুর। তাই তত্ত্বের ক্ষেত্র ছেড়ে যখন আসা যায় তখন সত্য সৌন্দর্য্য প্রেম যে রূপে আত্ম প্রকাশ করে তা হচ্ছে বহু বিচিত্র, তা মৃতের মুখের

মত অবিচল অচঞ্চল নয়। তাই এই অসীম বিশ্বের পানে তাকিয়ে যিনি পরম সত্যকে দেখেন তিনি এককে দেখেন সহস্র শীর্ষরূপে, ভাবকে দেখেন অনন্ত অভিব্যক্তিতে, রসকে দেখেন রাসের বহু বিলাসে।

এখানে সাদৃশ্যের বাহ্যিক মায়ায় পড়ে কেউ বলতে পারেন যে তা হলে কি জীবনে নিষ্ঠাহীনতাটাই সত্যি কথা? একটি সত্য থেকে আর একটি সত্যে, একটি সুন্দর থেকে আর একটি সুন্দরে, একটি ভালবাসা থেকে আর একটি ভালবাসায় এই যে চঞ্চল চলা এই কি পরম সত্য বোধের বিকাশ? তা হলে মতান্তর ভাবান্তর আর মনান্তর এই পরম সত্যকে পাওয়ার প্রমাণ?

২

আমরা ফুল ভালবাসি, শিশু ভালবাসি। ফুলের প্রতি এই যে আমাদের ভালোবাসা, শিশুর প্রতি আমাদের এই যে ভালোবাসা এর কথা একটু আলোচনা করলেই দেখতে পাই যে যদিচ তত্ত্বজ্ঞ বেশ এক কথায় পুষ্পত্ব আর শিশুত্ব বলে আমাদের ভালবাসার মূলে একটি মাত্র বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেন, তবু এই পুষ্পত্ব আর শিশুত্বকে তার প্রকাশ বাদ দিয়ে ধরবার কোনোই উপায় নেই। শিশুর প্রকাশের বাস্তব ভঙ্গীটুকু বাদ দিয়ে ফুলের বাস্তব বিকাশের বিশিষ্টতা-গুলো বাদ দিয়ে, শিশুত্ব আর পুষ্পত্ব কোথাও পাবার উপায় নেই।

মোট কথা তত্ত্বজ্ঞেরা যতই শিশু আর ফুলের অন্তর্দ্দেশে দিব্যদৃষ্টি চালনা করে কোনো এক নির্ব্বিশেষ সত্তার কল্পনা করুন না কেন, বাস্তবিক সত্তার রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত কোথাও ওই সব বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন তত্ত্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি, যাবে এমন ভরসাও নেই। মানুষ একদিন বিকাশের পথে শুধু তার মনুষ্যত্ব নামক গুণটি নিয়েই থাকবে, আর বাস্তবিক মানুষের সহস্র রকমের বিভেদ বৈচিত্র্যজ্ঞাপক চিহ্নগুলো আবরণ এবং জঞ্জালের মত সরে যাবে এ বিশ্বাস আমাদের কারু নেই।

বস্তুর প্রকাশ, সত্যের পরিচয় তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সমগ্রতার মাঝখানে। সে জীবন্ত, সুতরাং অশেষ।

৩

যে মানুষটিকে ভালবাসি বলচি তার বাইরের রূপের কত পরিবর্ত্তন, মনের গঠনের কত বিবর্ত্তন—তবু ভালবাসি ওই মানুষটিকে। ওই মানুষটির প্রাণ আমার অন্তরের সুমুখে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেচে বলেই তার নানা পরিবর্ত্তনের প্রত্যেকটি অবস্থাকেই তারই প্রাণের প্রকাশ বলে বুঝতে পারি—নিষ্ঠার মূল্য ওইখানে। একটি মাত্র মানুষেরই বিভিন্ন রূপের প্রতি অনুরাগ নিষ্ঠাকে ব্যভিচার দোষে মলিন করতে পারে না, কারণ সেই মানুষের অন্তরতম সত্তাটিকেই ওই নানা রূপের সঙ্গে একান্তভাবে দেখে আসচি।

তা হলে পরে যদি এমন ঘটে যে আর একটি মানুষের মধ্যেও আমি ওই আমার প্রিয় প্রাণের সে স্বরূপটির সাক্ষাৎ পেয়েচি তা হলে তাকে না ভালবাসা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। প্রাণের যে ভাব-মূর্ত্তি একটি মানুষকে আমার অন্তরে প্রিয় করে তুলেছিল, আরো একটি মানুষের মাঝে সেই ভাব-মূর্ত্তিরই স্ফূর্ত্তি ঘটে যদি, তা হলে সেও যে আমার প্রিয়, আমার ভালবাসার ধন হবে তাতে সংশয় হতে পারে না, এবং তাতে নিষ্ঠা-হীনতার কথাও উঠতে পারে না।

তা হলে নিষ্ঠার ব্যভিচার বলে কি কিছু নেই?

৪

সত্য করে যেখানে দেখা হয়েচে, যেখানে অশেষ সুন্দরের সাক্ষাৎ ঘটেচে সেখানে তো নিষ্ঠার অভাব, আগ্রহের অভাব ঘটতে পারে না। তা হলে ব্যভিচার হচ্ছে মিথ্যার জগতের কথা। সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ মেলে নি, মোহের ক্ষণিক মাদকতা আর তার পরেই

অতৃপ্তির চাঞ্চল্য সেখানে না এসে পারে না। এই যে বহুর ক্ষেত্রে প্রজাপতির মত চিরচঞ্চল ভ্রমণ—এ তো এককেই বহু বিচিত্র করে সহস্রশীর্ষ রূপে দেখার আনন্দে নয়, এ যে কোথাও কিছুই না পাওয়ার অস্বস্তি। তাই সে আজ বলে তোমায় ভালবাসি, কাল আবার আর একজনকে বলে তোমায় ভালবাসি—ভালবাসার সন্ধানই সে পেলে না! অসীমের রাজ্যে সে মুক্তি পেলে না, তাই কেবলি বহু ব্যক্তিত্বের দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরচে। এই ত মোহের অন্ধতা, অবিশ্বাসের অস্থৈর্য্য।

তাই দেখি তত্ত্বজ্ঞ এই পরম বিচিত্র সত্যকে বর্জ্জন করেন একত্বের মোহে, আর মোহান্ধ এই বিচিত্রের রস থেকে বঞ্চিত হয় বহুত্বের ব্যভিচারে।

শেষ-শয্যায়

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

সরাইখানার গোলমাল আসে কানে,
ঘরের সার্সিটি বাজে তাহাদের গানে,
পর্দ্দাটি উড়ে যায়
তাদের হাসির ঝড়ের আঘাতে হায়!
—মদের পাত্র গিয়েছে কবে যে ভেঙে!
আজো মন ওঠে রেঙে'
দিলদারদের দরাজ গলার রবে
সরায়ের উৎসবে!
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়
পেয়ালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায়
বেহুঁশ হাওয়ার বুকে!
সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন নেচে ওঠে মোর মুখে!
পাণ্ডুর দুটি ঠোঁটে
ডালিমফুলের রক্তিম আভা চকিতে আবার ফোটে!
মনের ফলকে জ্বলিছে তাদের হাসিভরা লাল গাল!

ভুলে গেছে তারা এই জীবনের যতকিছু জঞ্জাল ;
আখেরের ভয় ভুলে'
দিলওয়ার প্রাণ খুলে'
জীবন-রবাবে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি !
অদূরে আকাশে মধুমালতীর পাপড়ি পড়িছে ঝরি',
নিবিছে দিনের আলো,
জীবন মরণ দুয়ারে আমার,—কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন !
পূর্ণ হয়নি পিপাসী প্রাণের একটি আকিঞ্চন,
খুলিনি একটি দল,
যৌবন-শতদলে মোর হায় ফোটে নাই পরিমল,
উৎসব-লোভী অলি
আসেনি হেথায়,—
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়েছে কবে কামনার কলি !
—সারাটি জীবন বাতায়নখানি খুলে
তাকায়ে দেখেছি নগরী-মরুতে ক্যারাভেন্ যায় দুলে'
আশা-নিরাশার বালুপারাবার বেয়ে'
সুদূর মরূদ্যানের পানেতে চেয়ে !
—সুখ দুঃখের দোদুল ঢেউয়ের তালে
নেচেছে তাহারা,—মায়াবীর যাদুজালে
মাতিয়া গিয়েছে,—খেয়ালী মেজাজ খুলি !
মৃগতৃষ্ণার মদের নেশায় ভুলি'
মস্তানা সেজে ভেঙে গেছে ঘর-দোর ;
লোহার শিকের আড়ালে জীবন লুটায়ে কেঁদেছে মোর !
কারার ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে বান্দার মত হায়
কেঁদেছে বুকের বেদুইন মোর দুরাশার পিপাসায় !
জীবন-পথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলে উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে !

কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে,
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে,
সারাটি নিশীথ খুন্-রোশনাই-প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি ;
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি তাহা যে টের !
দূর দিগন্তে চলে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের !
কোন্ সুদূরের তুরাণী-প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে !
দীর্ঘ দিবস বয়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের রোজা !
আমার গগনে 'ঈদ্‌রাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা
পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা !
কি যে মিঠে এই সুখের দুখের ফেণিল জীবনখানা !
এই যে নিষেধ, এই যে বিধান—আইনকানুন, এই যে
শাসনমানা,
ঘর দোর ভাঙা তুমুল প্রলয়ধ্বনি,
নিত্য গগনে এই যে উঠিছে রণি' !
বিদ্রোহীদের নট-নর্ত্তন-তালে
ভাঙনের গান এই যে বাজিছে দেশে দেশে কালে কালে !
এই যে তৃষ্ণা দৈন্য দুরাশা জয় সংগ্রাম ভুল
সফেণ সুরার ঝাঁঝের মতন করে দেয় মজগুল্
দিওয়ানা প্রাণের নেশা !
ভগবান,—ভগবান তুমি যুগ যুগ থেকে ধরেছ শুঁড়ির পেশা !
—লাখো জীবনের শূন্য পেয়ালা ভরি দিয়া বারবার
জীবন-পান্থশালার দেয়ালে তুলিতেছ ঝঙ্কার,
মাতালের চীৎকার !
অনাদি কালের থেকে ;
—শেষশয্যায় মাথা পেতে তারই দস্তুর যাই দেখে !

—হেরিলাম দূরে বালুকার পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে বয়ে যায় !
কোটি শুঁড় দিয়ে দুখের মরুভূ নিতেছে তাহারে শুষে,
ছলামরীচিকা জ্বলিতেছে তার প্রাণের খেয়াল-খুশে,
মরণ-সাহারা আসি'
নিতে চায় তারে গ্রাসি,
তবু সে হয় না হারা,
ব্যথার রুধির ধারা
জীবন-মদের পাত্র জুড়িয়া তার
যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার !

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

জমিদারের চাপ্‌রাশী মহতাপ্ সেদিন পাকা ধানের ক্ষেত হইতে গণেশ পাঁড়ের দুইটি গরু ধরিয়া আনে।

নবীন বলিল, "দিয়ে এসো খোঁয়াড়ে।"

মক্‌বুল মিঞার খোঁয়াড় ঠিক পাঁড়ে-পাড়ার পাশেই। হাতে একটা লম্বা লাঠি লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া মহতাপ্ গরু দিতে গেল।

মক্‌বুলের ঘরের সুমুখে বাঁশ-বাঁখারি দিয়া খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, দিনের রৌদ্রে এবং রাত্রির হিমে অপরাধী গরু-বাছুরগুলা সেই ফাঁকা জায়গাটায় আটকানো থাকে, জলে-গোবরে দিনরাত সেখানে কাদা প্যাচ্-প্যাচ্ করে, বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ওঠে, মশা ও মাছির ভ্যান্-ভ্যানানিতে মানুষ সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

পাশেই তাহার ছোট ভাই ইয়াসিনের ঘরের চালার চতুর্দ্দিকে ছোট-বড় নানারকমের চটের পর্দ্দা ঝোলে, কয়েকটা পোষা-মুরগী চারিদিকে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সেই চটের পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দিনরাত একটা হাত-সেলাইএর কল-চালানোর একঘেয়ে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ঘরের এই আব্রু সম্বন্ধে এত বেশি সতর্ক ইয়াসিন পূর্ব্বে কখনও ছিল না, কিন্তু মক্‌বুলের সঙ্গে কতকগুলা চুরি করা চামড়ার ভাগ লইয়া সম্প্রতি একটা মামলা-মোকর্দ্দমা হওয়ার পর হইতে ইয়াসিনের ঘরে চটের পর্দ্দার সংখ্যা যেন কিছু বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইয়াসিন মিঞা সেকথা স্পষ্টই স্বীকার করে। বলে, "হাজার হোক্